Certify that the thesis entitled, **"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে সামান্যের একটি পর্যালোচনা"**, submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy, Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil. Regulation (2017) of Jadavpur University.

Bhabesh Gayen
14.05.19

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Bhabesh Gayen entitled **"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে সামান্যের একটি পর্যালোচনা"**, is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy, Jadavpur University.

P. Sarkar 14/05/19	14/05/19	Mousumi Guha 14.5.19
Head	Supervisor &	Member of RAC
Dept. of Philosophy	Convener of RAC	
Head **Department of Philosophy** **Jadavpur University** **Kolkata-700 032**	**Professor** **Department of Philosophy** **Jadavpur University** **Kolkata-700 032**	Associate Professor Department of Philosophy Jadavpur University Kolkata - 700 032

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে সামান্যের একটি পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রে
এম. ফিল. উপাধি প্রাপ্তির
আবশ্যিক অংশ রূপে প্রদত্ত

ভবেশ গায়েন
দর্শন বিভাগ
রেজি নং–1 4 2 3 9 3 of 2 0 1 7 – 1 8
রোল নং– MP P H 1 9 4 0 1 2

মে, ২০১৯

উৎসর্গ

যাঁদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হত না, তাঁদের উদ্দেশ্যে

“শত বার আমি নিজেকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে আমার অর্ন্তলোক এবং বাহ্যজীবন জীবিত ও মৃত বহু ব্যক্তির শ্রমের ফলে পরিপুষ্ট। তাদের কাছ থেকে আমি যে ভাবে গ্রহণ করেছি ও করছি সেই ভাবে নিজেকেও বিকীর্ণ করে দেওয়া উচিত।”

-আইনস্টাইন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম. ফিল. উপাধির জন্য এই গবেষণা নিবন্ধের উপস্থাপন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীচরণে আমার প্রণাম নিবেদন করি। আমার এই অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্যে শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়ভাজনদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা পেয়েছি, যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমার এই অভিসন্দর্ভটির রচনা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠত না। তাদের প্রতি আমি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করছি।

প্রথমে আমি আমার পিতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গায়েন ও মাতা শ্রীমতী সুচিত্রা গায়েন-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কেননা তাঁদের সমস্ত প্রকার ত্যাগ, উৎসাহ, অশীর্বাদ ছাড়া আমি এই অভিসন্দর্ভটিকে সম্পন্ন করতে পারতাম না। এছাড়াও আমার ভ্রাতৃদ্বয় শ্রী অরূপ গায়েন ও শ্রী তাপস গায়েনকে ধন্যবাদ জানাই, এবং ধন্যবাদ জানাই সুজাতা মণ্ডলকে সদা উৎসাহ প্রদানের জন্য ও অতি ব্যস্ততার মধ্যেও অভিসন্দর্ভটির প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করার জন্য।

যাঁর সাহায্য ছাড়া এই অভিসন্দর্ভটি কোন ভাবেই পরিসমাপ্ত হত না তিনি হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সমর কুমার মণ্ডল মহাশয়। তিনি নিজের অতি ব্যস্ততার মধ্যেও উক্ত অভিসন্দর্ভটির প্রায় প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেছেন। প্রতিটি

মুহূর্তে উৎসাহ প্রদান করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং উপযুক্ত গ্রন্থাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়াও দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রয়াস সরকার মহাশয়ের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় অপরিসীম উৎসাহ প্রদান করেছেন। এই আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কেননা তাঁদের 'Junior Research Fellowship' বিভাগ আমার গবেষণার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী এবং অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মহারাজদের প্রতি । কেননা তাঁদের জন্যই হয়তোবা আজ শিক্ষার তথা উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছি। সেইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাননীয় কৌশিক মজুমদার মহাশয়ের প্রতি। যিনি আমার বিদ্যামন্দিরে পড়াশুনার প্রথম পথপ্রদর্শক।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার শুভানুধ্যায়ী ও যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমার এই অভিসন্দর্ভটিকে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। তাঁরা হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মী,

বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অতিথি অধ্যাপক তাঁদের সকলের প্রতিও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিয়ে আলোচনা করার সময় বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং সমবয়সী অনেক গবেষণাকারী ও সহপাঠকদের কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি, তাই তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ করে অধ্যাপক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শেখ আব্দুল হালিম মহাশয়ের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করে আমার অভিসন্দর্ভটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে যাদের নাম অনুল্লেখ থেকে গেল, তাঁদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

পরিশেষে, আমার স্বল্প জ্ঞানের পরিসর থেকে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লেখার সময় আমি আমার সাধ্যমতো যত্ন ও সতর্কতা নিয়েছি, তবুও যদি কোনোরকম কোথাও ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে তার দায় নিতান্তই আমার এবং তার জন্য আমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

৩১ ই বৈশাখ ১৪২৬ ভবেশ গায়েন

বেলুড় মঠ, হাওড়া।

সূচীপত্র

গোড়ার কথা ১-৭

প্রথম অধ্যায়: ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সামান্য ৮-২৫

১। সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক

২। সামান্যের বিভাগ প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক

দ্বিতীয় অধ্যায়: মীমাংসা দর্শনে সামান্য ২৬-৩৭

১। সামান্যের আলোচনার উৎপত্তি প্রসঙ্গে মীমাংসা দর্শন

২। সামান্য প্রসঙ্গে মীমাংসা ও ন্যায়-বৈশেষিক

৩। সামান্য প্রসঙ্গে প্রভাকর ও কুমারীল মত

৪। সামান্যে প্রসঙ্গে নারায়ন ভট্টের মত

তৃতীয় অধ্যায়: বৌদ্ধ ও জৈন মতে সামান্য ৩৮-৫৪

১। সামান্য প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা ও বৌদ্ধ

২। সামান্যের অস্বীকৃতি প্রসঙ্গে ন্যায়বিন্দুকারের ব্যাখ্যা

৩। ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত সামান্যতত্ত্ব খন্ডন প্রসঙ্গে বৌদ্ধ

৪। সামান্য প্রসঙ্গে জৈন মত

৫। জৈনদের সামান্য সম্পর্কিত মত খন্ডনে ন্যায়-বৈশেষিক

চতুর্থ অধ্যায়: প্লেটোর মতে ধারণাতত্ত্ব ৫৫–৭৩

১। সামান্যের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দর্শন

২। ধারণাতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্লেটো

৩। প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

৪। প্লেটোর ধারণাতত্ত্বে পূর্ববর্তী দার্শনিকদের প্রভাব

পঞ্চম অধ্যায়: অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যায় সামান্য ৭৪–৯২

১। অধিতত্ত্ব প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলঃ

২। প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের সিমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল

৩। সামান্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল

৪। অ্যারিস্টটলের সামান্যতত্ত্বের সিমাবদ্ধতা

উপসংহার ৯৩–১০১

গ্রন্থপঞ্জী ১০২–১০৫

গোড়ার কথা

অধিবিদ্যা দার্শনিক আলোচনার এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন শাখায় জগত ও জীবন নিয়ে আলোচনাই মুখ্য। কিন্তু অধিবিদ্যায় জগত ও জীবন চর্চা ছাড়াও আলোচনায় স্থান পায় জগত অতিবর্তী ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি বিষয়। অধিবিদ্যার সাধারণত ইংরেজি তর্জমা করা হয় 'Metaphysics' । 'Meta' অর্থে এক্ষেত্রে 'অধি' বা 'পূর্ববর্তী' এবং 'Physics' অর্থে সাধারণত বোঝানো হয় জ্ঞানবিদ্যা বা জগত সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনাকে। অর্থাৎ অধিবিদ্যায় জগত অতিবর্তী পরমসত্তার আলোচনাই মুখ্য। যদিও পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট প্রকৃতিগত অধিবিদ্যার কথা স্বীকার করছেন (Metaphysics in natural disposition) । কিন্তু গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল অতিবর্তী অধিবিদ্যাকে (Transcendental Metaphysics) 'First Philosophy' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনা হল অধিবিদ্যার আলোচনা। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা হল ভৌত জগত সম্পর্কিত । যদিও পরবর্তীকালে 'Andronicus' উক্ত অ্যারিস্টটল এর বিভিন্ন লেখা সংকলন করার সময় 'Physics' এর আলোচনার পর কাকতালীয় ভাবে ' First Philosophy' এর বিষয় সংকলন করেন, এবং তা ঘটনাক্রমে 'Metaphysics' নামে পরিচিত হয়। উক্ত অতিবর্তী অধিবিদ্যা দর্শনের এক অন্যতম

বিমূর্ত বিষয়ের আলোচনা। যদিও তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। দৃশ্যমান জগতে তার নির্দেশক মুল্য (Denotative Value) সেভাবে না পাওয়া গেলেও এটা বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা গ্রাহ্য, এবং উপলব্ধিগত অর্থই মুখ্য। এপ্রসঙ্গে B. Russell বলেছেন, "By Metaphysical entities I mean those things which are supposed to be part of the ultimate constituents of the world, but not to be the kind of thing that is ever empirically given"[1]। এদিক থেকে অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন - অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় প্রত্যক্ষ গোচর নয়, তা শুধুই যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণ নির্ভর [... In short, they (Metaphysics) decide on the basis of argument and analysis][2]। তেমনি নীতিবিদ্যায় ' তোমার এটা করা উচিৎ', ' এটা করা ভালো', ' সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ' প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাস্তব জগতে বিভিন্ন মানুষের সুখ প্রত্যক্ষ করে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত এমনটি নয়, বরং তা বিমূর্ত ও প্রত্যক্ষের অতিবর্তী।

কিন্তু অধিবিদ্যাকে আমরা যেমন ইংরেজি তর্জমা করি 'Metaphysics', তেমনি অধিনীতিবিদ্যাকে আমরা ইংরেজি তর্জমা করি 'Meta-ethics'। যদিও উক্ত দুটি বিষয়ের আলোচ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় দৃশ্যমান জগত অতিবর্তী বিষয়, কিন্তু অধিনীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা, নীতিবিদ্যা

---

[1] Stephen, *Russell on Metaphysics*, Routledge, 3.
[2] Ibid., 4.

অতিবর্তী বিষয়। অর্থাৎ অধিনীতিবিদ্যা - নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়ের (কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোন কাজটা করা উচিৎ, কোন কাজটা করা উচিৎ নয় প্রভৃতির) প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। যেমন - আমরা যখন বলি এই কাজটা করা ভালো, কিন্তু তার থেকেও প্রাথমিক প্রশ্ন হল ভালো বলতে আমরা কি বুঝি ? 'ভালো' (Good) এর সংজ্ঞা কি ? 'ভালো'কে আদৌ ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় ? বা ভালো(Good)-এর বিষয় কি কোন উদাহরণের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব ? অর্থাৎ নৈতিক বিষয় ভালো-মন্দের, সুখ-দুঃখের, উচিৎ-অনুচিতের ভাষাগত বিশ্লেষণ করে অধিনীতিবিদ্যা বা 'Meta-ethics' । অপরদিকে অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় দৃশ্যমান জগতে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা বিচার বিবেচনার সাহায্যে সারসত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ।

উক্ত অধিবিদ্যার প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য আছে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বা মধ্যযুগীয় (প্রধানত) ধর্মকেন্দ্রিক দার্শনিক আলোচনায় কখনো কখনো অধিবিদ্যক আলোচনার কেন্দ্রস্থল হয়েছে, সকল কার্যের কারণ যা নিজে অ-কারণ, সকল চালিকা শক্তির কারণ কিন্তু নিজে স্থির (Unmoved Mover or First Cause) । আবার কখনো কখনো তা সর্বসাধারণ সত্তার (Being qua being) রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের কাছে অধিবিদ্যার আলোচনার রূপ বদলাতে থাকে। এখানে শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্বের এবং ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে আলোচনাই সীমাবদ্ধ থাকল না। দেহ-মনের সম্বন্ধ, আত্মার অমরত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতিও

আলোচনার বিষয় হল। (... They took it to be concerned not merely with the existence and nature of God, but also with the distingtion between mind and body, the immorality of the soul, and freedom of the will.)[3]। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতাবাদী ও বিচারবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট মনে করেন যে, পূর্বোক্ত দার্শনিকরা তাঁদের জ্ঞানের পরিসীমা অতিক্রম করেছেন। কেননা কান্টের মতে, অতিবর্তী অধিবিদ্যা বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হতে পারেনা। কোন বিষয়ের জ্ঞান হতে গেলে 'Sensibility' ও 'Understanding' উভয়ের প্রয়োজন। কিন্তু অতিবর্তী অধিবিদ্যা 'Sensibility'- এর বিষয় হতে পারে না । এবং যা 'Sensibility' এর বিষয় নয়, তাতে 'Understanding' প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা কান্টের মতে, যদিও আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস অভিজ্ঞতা, কিন্তু জ্ঞান হতে গেলে শুধু অভিজ্ঞতা নয়, তাতে বুদ্ধিরও ভূমিকা আছে। ' There can be no doubt that all our knowledge begins with experience. But though all our knowledge begins with experience, it does not follow that it all arises out of experience.'[4] । ফলত অতিবর্তী অধিবিদ্যা বিষয়ে যেহেতু আমাদের কোন 'Sensibility' গড়ে ওঠে না, সেহেতু সেই সকল বিষয়ে আমাদের কোন 'Understanding' গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই কান্টের মতে,

---

[3]Michael, *Metaphysics: A Contemporary Introduction,* Routledge, 1.

[4] Norman Kemp, *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason,* Macmillan and CO., 41.

অতিবর্তী অধিবিদ্যা জ্ঞানগতভাবে সম্ভব নয়, তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু প্রকৃতিগত অধিবিদ্যা জ্ঞানগতভাবে সম্ভব এবং উক্ত অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল-‘ ...the most genetal structures at work in our thought about the world’[5]। যার দ্বারা পরবর্তী পাশ্চাত্য দার্শনিকরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অধিবিদ্যা বিষয়ে আরও অনেক বিস্তারিত আলোচনা আছে কিন্তু আমি সে বিষয়ে বিস্তর আলোচনা না করে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে সামান্যের আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করবো।

সামান্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হল একাধিক বস্তুর মধ্যে একজাতীয় ধর্ম। অনুগত বা একেকার প্রতীতির কারণ সামান্য। বহু বস্তুর মধ্যে যে একজাতীয় ধর্ম থাকে তাকে সমান ধর্ম বলে। আর এই সমজাতীয় ধর্ম সামান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন - মনুষ্যত্ব হল সকল মানুষের সমান ধর্ম, গোত্ব হল সকল গরুর সমান ধর্ম। এপ্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে এই যে মনুষ্যত্ব, গোত্ব ইত্যাদি সামান্য, তা কি ব্যক্তি মানুষ বা ব্যক্তি গরুতে অবস্থান করে ? না কি তার ব্যক্তি অতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে ? তা কি নিত্য ? না অনিত্য ? তা কি এক ? না বহু ? এসকল অনেক প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন দর্শনে এই সকল প্রশ্নের নানা ব্যাখ্যা ও বিচার পাওয়া যায়। এসকল প্রশ্ন একজন সাধারণ মানুষকে ভাবালে বা না ভাবালেও, যারা দার্শনিক বা দর্শন অনুরাগী অর্থাৎ উচ্চ চিন্তার সাথে যারা কম বেশি যুক্ত তাঁদের বেশ ভাবিয়েছে এবং ভাবাচ্ছে। মানুষের জানার

---

[5] Michael, *Metaphysics: A Contemporary Introduction,* Routledge, P-1.

ক্ষিদে চিরদিন থাকবে, আর এসকল প্রশ্নও জেগে থাকবে। ভারতীয় দর্শনে – বিশেষত বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা দর্শনে সামান্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে। আসলে সামান্য সম্পর্কিত সমস্যাটি হল আধিবিদ্যক সমস্যা। সামান্যকে যদি আমরা আধিবিদ্যক অর্থে গ্রহণ করি তখন তা স্বভাবতই নিত্য এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় হয়। বিভিন্ন দার্শনিকরা উক্ত সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ নিয়ে নানা মত প্রদান করেছেন। কিন্তু আমরা যদি সামান্যকে আধিবিদ্যক সমস্যা হিসাবে গণ্য না করে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা হিসাবে আলোচনা করি তখন তা আর সামান্য সম্পর্কিত সমস্যাই থাকে না। কেননা যদি আমরা অভিজ্ঞতায় ভৌতিক জগতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে গণ্য করি তাহলে সেটি একটি বিশেষ শ্রেণী হবে, তার অতিরিক্ত কিছুই নয়। কেননা অভিজ্ঞতায় তার থেকে বেশি কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। যা বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় তা যদি অভিজ্ঞতায় অনুসন্ধান করা হয় তাহলে সেটি ব্যর্থ প্রয়াস। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় যে, সামান্য যা নিত্য তার সাথে অনিত্য জাগতিক বস্তুর সম্বন্ধ কি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? এমনই নানা বিষয়বস্তু উক্ত অভিসন্দর্ভটিতে যথাসাধ্য আলোচনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এখানে প্রাচ্য বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় তথা দার্শনিকদের মত আলোচিত হয়েছে। যেমন বস্তুবাদী (Realist) ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সামান্য সম্পর্কিত মত যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি বিভিন্ন মীমাংসা সম্প্রদায়ের মতও আলোচিত হয়েছে। আবার অপরদিকে নামবাদী (Nominalist) রূপে পরিচিত বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়ের মত যেমন আলোচনায় স্থান পেয়েছে তেমনি প্রত্যয়বাদী (Conceptualist) রূপে পরিচিত

জৈন মতও আলোচিত হয়েছে। আবার গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সামান্য সম্পর্কিত মত যেমন স্ববিস্তর আলোচিত হয়েছে তেমনি পাশ্চাত্যে নামবাদীদেরও মত যতসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের কোন্ মত বেশি গ্রহণীয় বলে মনে হয় সেটিও আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আবার অল্পবিস্তর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতের তুলনামূলক আলোচনাও করার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

সামান্য প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক মত

সামান্যের ধারণা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সপ্ত পদার্থের চতুর্থ পদার্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । অনুগত বা একাকার প্রতীতির কারণ সামান্য। সামান্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হল একাধিক বস্তুর মধ্যে যে একজাতীয় ধর্ম বর্তমান। বহু বস্তুর মধ্যে যে একজাতীয় ধর্ম বর্তমান থাকে তাকে সমধর্ম বলে। আর এই সমজাতীয় ধর্ম সামান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- মনুষ্যত্ব হল সকল মানুষের সমান ধর্ম, গোত্ব হল সকল গরুর সমান ধর্ম। এপ্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে এই যে মনুষ্যত্ব, গোত্ব প্রভৃতি যে সামান্য তা কি ব্যক্তি মানুষ বা ব্যক্তি গরুতে অবস্থান করে ? না কি তার ব্যক্তি অতিরিক্ত সতন্ত্র সত্ত্বা আছে ? তা কি নিত্য ? না অনিত্য ? তা কি এক ? না বহু ? এসকল অনেক প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন দর্শনে এই সকল প্রশ্নের নানা ব্যাখ্যা ও বিচার পাওয়া যায়। এসকল প্রশ্ন একজন সাধারণ মানুষকে ভাবালে বা না ভাবালেও, যারা দার্শনিক অর্থাৎ উচ্চ চিন্তার সাথে যারা কম বেশি জড়িত তাঁদের বেশ ভাবিয়েছে এবং ভাবাচ্ছে। মানুষের জানার ক্ষিদে চিরদিন থাকবে, আর এসকল প্রশ্নও জেগে থাকবে।

১। সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকঃ- ভারতীয় দর্শনে, বিশেষত বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়- বৈশেষিক, মীমাংসা দর্শনে সামান্য নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে। আমরা তার বিভিন্ন দিকে যথাসাধ্য আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের ১/২/৩ সূত্রে সামান্যের আলোচনায় বলেছেন, **"সামান্যম্ বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্"।** এর অর্থ হিসাবে কেউ কেউ মনে করেন, সামান্য ও বিশেষ এই দুটিই জ্ঞানবিশেষ সাপেক্ষ। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সামান্য - বিশেষ অপেক্ষাবুদ্ধির বিষয়। যদিও এই সূত্রের যথার্থ অর্থ নিয়ে পরবর্তী আচার্য্যদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে।[1] তবে উক্ত বিষয়ের বিস্তর আলোচনা প্রশস্তপাদভাষ্যে পরিলক্ষিত হয়, যদিও প্রশস্তপাদাচার্য উদ্দেশ ও পরীক্ষা প্রকরণে সামান্যের প্রথাগত লক্ষণ নির্দেশ না করে গ্রন্থের শুরুতেই সামান্যের বিভাগাদি প্রণয়ন করেছেন।**"সামান্যম্ দ্বিবিধংপরমপরং চানুবৃতিপ্রত্যয়কারনম্ । তত্র পরং সত্তা মহাবিষয়ত্বাৎ, সা চানুবৃতেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব। দ্রবত্বাদ্যপরমল্পবিষয়ত্বাৎ তচ্চ ব্যাবৃত্তেরপি হেতুত্বাৎ সামানং সদ্বিশেষাখ্যামপি লভতে"[2]।। ৬।।** অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার পর ও অপর। এবং তা অনুগতজ্ঞানের বা আনুগতপ্রতীতির কারণ। এই দুই প্রকার সামান্যের মধ্যে পরসামান্য হল সত্তা – যেহেতু তা মহাবিষয়ক অর্থাৎ তার আশ্রয় বহু পদার্থ। এবং সেই সত্তা আনুবৃত্তির কারণ বলেই সামান্য। (আনুগত বুদ্ধি সামান্যের লক্ষণ ও ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি বিশেষের লক্ষণ)। দ্রবত্ব , গুনত্ব প্রভৃতি অপর সামান্য। কেননা তার বিষয়

[1] প্রদ্যোত, *বৈশেষিক দর্শন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৪৩।

[2] দণ্ডিস্বামী, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৮৮।

সত্তাপেক্ষা অল্পাশ্রয়ে বিরাজমান। দ্রবত্বাদি আনুগত ও ব্যবৃত্তির (ইতরভেদের) কারণ বলে সামান্য হয়েও বিশেষ আখ্যা পেয়েছে। একারণে দ্রবত্বাদিকে সামান্য বিশেষ বলা হয়। যদিও পরাপর নামক অপর একপ্রকার সামান্য অনেকে স্বীকার করেন, যেমন - বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদে "সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং" বলে পরে দ্রব্যত্বাদি জাতিকে "পরাপর সামান্য" বলেছেন। আবার ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্যও পর ও অপরভেদে দ্বিবিধ সামান্য ব্যাখ্যা করে পরে ভাষ্যোক্ত 'পরমপরঞ্চ' এই চকারকে সমুচ্চয়ার্থক বলে ত্রিবিধ সামান্যই স্বীকার করেছেন।[3]

স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে যে, সামান্যকে কেন চতুর্থ প্রকার পদার্থ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে ? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সামান্য দ্রব্য, গুন ও কর্মে আশ্রিত বলে উক্ত তিন পদার্থ আলোচনা করার পরে সামান্যের আলোচনা করা হয়েছে। "এক্ষেত্রে উল্লেখ্য **'সামানানাং ভাবঃ'** এইরূপ অর্থে সমান শব্দের উত্তর 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় করে সামান্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে"[4]। এর অর্থ হল সমানধর্ম , যদিও ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে সামান্য শব্দটি ঠিক 'সমানধর্ম' অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে পরিভাষাগত ভাবে 'জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত সামান্যের লক্ষণ পরবর্তী বৈশেষিক তথা ন্যায়-বৈশেষিক সমুচ্চয় নানা গ্রন্থে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন - কিরণাবলীকার সামান্যের একাধিক লক্ষণ নির্দেশ করেছেন,

---

[3] শ্রীমৎ পঞ্চানন, শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্য্যবিরচিতঃ *ভাষা-পরিচ্ছেদঃ* সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিতঃ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৬১।

[4] দণ্ডিস্বামী *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৮৯।

যথা- প্রথমত, **‘সমানানংভাবঃ স্বাভাবিকো নাগুন্তকোঃ ধর্ম্মঃ সামান্যমিত্যর্থঃ’**[5]**।** অর্থাৎ সমান বা তুল্য ব্যক্তিসমূহের ভাব, যা আগুন্তক নয়, স্বাভাবিক, সেই ধর্মই সামান্য। এর থেকে বোঝা যায় সামান্য যে ধর্মীর ধর্ম তা বহুসংখ্যক, একক নয় ; যার জন্য সামান্য হল, **‘সমানানাং ভাবঃ’**। এবং এই সমানধর্ম স্বাভাবিক, আগন্তুক নয় ; যদিও স্বাভাবিক বলতে এখানে স্বভাবজন্য নির্দেশিত হয় না। স্বভাব জন্য বা স্বভাবে আশ্রিত বললে জাতি ও উপাধি উভয়কেই সামান্য বলতে হয়। কেননা, উপাধিও স্বভাবে আশ্রিত হয়। এখানে ‘স্বাভাবিক’ কথার অর্থ বুঝতে গেলে ‘অনাগন্তুক’ অর্থে বুঝলেই যথার্থ মানে হয়। আগন্তুক অর্থে ধর্ম বলতে সেই ধর্মকে বোঝায়, যা কোন ধর্মী উৎপত্তির পরে উৎপন্ন হয় এবং উক্ত ধর্মীতে সর্বদা থাকে না। অন্যদিকে অনাগন্তুক ধর্ম হল সেই ধর্ম, যা কখনো ধর্মীতে উৎপন্ন হয় না বা কোন অবস্থাতেই ঐ ধর্ম ছাড়া ধর্মী থাকতে পারে না। অর্থাৎ অনাগন্তুক ধর্মে ধর্মী ও ধর্ম সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ। যেমন - ‘মনুষ্যত্ব’ সামান্যধর্ম হল ‘মানুষ’ ধর্মীর অনাগন্তুক বা স্বাভাবিক ধর্ম। কাজেই ‘মনুষ্যত্ব’ সামান্য ব্যক্তিমানুষ উৎপত্তির পূর্বেই থাকে এবং ব্যক্তিমানুষের বিনাশের পরেও অবিনশ্বর থাকে।

দ্বিতীয়ত, কিরণাবলীকার বলেছেন, **‘নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্যমিতি সামান্যলক্ষনং সূচিতং ভবতি’**[6]। অর্থাৎ যা নিত্য, এক এবং অনেকবৃত্তি তাই সামান্য। ন্যায়-বৈশেষিক

---

[5] প্রদ্যোত, *বৈশেষিক দর্শন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৪৩।

[6] তদেব, ১৪৪।

মতে, সামান্য নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত। ধর্মীর বিনাশের পরেও সামান্যধর্ম অবিনশ্বর থাকে এবং কালে অবস্থান করে। উক্ত লক্ষণের পদগুলির বিবক্ষিত অর্থ হল, সামান্য 'এক' এই অর্থে তা একটি নয় , প্রতিটি সামান্য এক, বহু নয় । যেমন - প্রতিটি মানুষের মধ্যে সাধারণ ধর্ম, সামান্য ধর্ম মনুষ্যত্ব এক, বহু নয় এটাই উক্ত সামান্যের লক্ষণের 'এক' পদের অর্থ। যদিও পণ্ডিতগণের মধ্যে উক্ত বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। অনেকের মতে 'এক' পদটি নিছক স্বরূপ বর্ণনা, নিত্যত্ব ও অনেকবৃত্তিত্বই লক্ষণসূচক। কেননা, বহু অধিকরণের সমানধর্ম এক হওয়াটাই স্বাভাবিক, তা না হলে সমানধর্ম কথাটাই অর্থহীন হয়। কোন মতে লক্ষণস্ত **'এক'** পদের দ্বারা সামান্য যে নিষ্প্রতিযোগিক সেটিই বোঝান হয়েছে। অভাব ও সমবায় থেকে সামান্যের বৈলক্ষণ প্রদর্শনই হল 'এক' পদের অর্থ। অভাব ও সমবায় ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রতিযোগীর জ্ঞানের প্রসঙ্গ আসে। 'ঘটাভাব' এর ব্যাখ্যা করতে গেলে তার প্রতিযোগী 'ঘট' দিয়েই ব্যাখ্যা করতে হয়। সমবায় বলতে সম্বন্ধ অর্থাৎ রূপ-সমবায়, স্পর্শ-সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধেই জানতে হয়, যা প্রতিযোগীহীন হয় না । কিন্তু সামান্য সে অর্থে নিষ্প্রতিযোগিক মানেই 'এক' । অন্যের সহযোগিতা ছাড়াই সামান্য ব্যাখ্যাত। সামান্যের লক্ষণে ভিন্ন একটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা হল **'অনেকবৃত্তি'** । এখানে 'অনেকবৃত্তিত্ব' বলতে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব বুঝতে হবে। কেননা, সমবায় ও অত্যন্তাভাব নিত্য এবং স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আশ্রয়ে আশ্রিত। তাই অনেক বৃত্তিত্ব সমবায় ও অত্যন্তাভাবেও আছে। সুতরাং শুধু অনেকবৃত্তিত্ব বললে উক্ত লক্ষণটি

সমবায় ও অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি হয়। সমবায় সম্বন্ধ ও অত্যন্তাভাব নিত্য এবং তারা স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আশ্রয়ে থাকে। সুতরাং অনেকবৃত্তিত্ব সমবায় ও অভাবে থাকলেও তারা কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। তাই সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব বললে সমবায়ে ও অভাবে সামান্যের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। কাজেই কিরণাবলীকারের মতে, সামান্য হল নিত্য, এক ও অনেকের মধ্যে সমবেত ধর্ম। তাহলে বোঝা গেল যে, একবৃত্তিত্ব সামান্য নয়। সামান্য ধর্মের ধর্মী বহু অর্থাৎ অনেকবৃত্তিত্ব। আবার অনেকবৃত্তিত্ব না বলে কেবল সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব বললে আকাশের পরিমাণ (পরমহৎপরিমাণ) নিত্য অথচ সমবায় সম্বন্ধে আকাশে বৃত্তি বলে আকাশের পরিমাণ সামান্যের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যেত। তাই অনেকবৃত্তিত্ব বলা হয়েছে।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর মুক্তাবলীতে সামান্যের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন, **‘নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্তম্’**[7]। অর্থাৎ নিত্যত্ব সমানাধিকরণ অনেক সমবেতত্বই হল সামান্যের লক্ষণ। সুতারাং এক্ষেত্রে সামান্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি – নিত্যত্ব ও অনেকসমবেতত্ব। এক্ষেত্রে দুটি পদই সমান গুরুত্বপূর্ণ । কেননা, ‘নিত্যত্ব’ না বলে শুধু ‘অনেকসমবেতত্ব’ বললে লক্ষণটি সংযোগাদিতে অতিব্যাপ্তি হতো, কেননা বৈশেষিক মতে, সংযোগাদি গুণ অনেক দ্রব্যেই সমবেত হয়ে থাকে। কিন্তু তা অনিত্য। কাজেই ‘নিত্যত্ব’ ধর্মটি সংযোগাদিতে অতিব্যপ্তি হয় না। আবার অনেক সমবেতত্ব না বলে সামান্যের লক্ষণ

---

[7] প্রদ্যোত, *বৈশেষিক দর্শন,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৪৪।

যদি, শুধুই নিত্যত্ব করা হতো তাহলে গগনের পরিমাণ নিত্য এবং তার অধিকরণ গগনে সমবেত, তাতে অতিব্যপ্তি হতো। কিন্তু গগন পরিমানে নিত্য, এবং তাতে সমবেতত্ব ধর্ম থাকলেও গগন এক হওয়ায়, উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত হয়না। অতএব উক্ত সামান্যের লক্ষণটি গগনাদি নামক একক বস্তুতে অতিব্যপ্তি হয় না । আবার লক্ষণের অন্তর্গত নিত্যত্বেসতি অনেকবৃত্তিত্ব বললে, সমবায়ত্ব না বললে অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি হতো। কেননা বৈশেষিক মতে, অত্যন্তাভাব নিত্য এবং অনেক সমবেত, কিন্তু তা সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি নয়। কেননা বৈশেষিক মতে, অভাবের বৃত্তিত্ব সর্বদা স্বরূপ সম্বন্ধেই হয়। সুতরাং সমবেতত্ব পদটি দ্বারা উক্ত লক্ষণ অত্যন্তাভাবে অতিব্যপ্তি বারিত করে। এছাড়াও অন্নংভট্ট বিরচিত তর্কসংগ্রহে সামান্যের লক্ষণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে,**‘নিত্যম্ একং অনেকানুগতং সামান্যম্’**[৪]। অর্থাৎ যা নিত্য, এক এবং অনেকানুগত তাই সামান্য। এক্ষেত্রে লক্ষণের অন্তর্গত প্রতিটি পদেরই গুরুত্ব সমপরিমান। যেমন, শুধুই যদি অনেক ‘সমবেতত্ব’ লক্ষণ হতো, তাহলে সংযোগাদিতে অতিব্যাপ্তি হতো। কেননা, সংযোগাদি অনেক সমবেত কিন্তু নিত্য নয়। তাই নিত্য পদটি দ্বারা সংযোগাদিতে অতিব্যাপ্তি বারিত হল।

আবার ‘অনেক’ পদটি না থাকলে, অর্থাৎ যদি শুধু **‘নিত্যত্বেসতি সমবেতত্বম্’** বলা হলে পরমাণু, কাল, আকাশাদি নিত্য দ্রব্যে, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি নিত্যগুনে অতিব্যপ্তি

---

[৪] শ্রীনারায়ণচন্দ্র, *শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ; সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ; অধ্যাপনাসহিতঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৫৩।

হতো। কেননা, তারা নিত্য, কিন্তু এক সমবেত, অনেক সমবেত নয়। এছাড়াও যদি নিত্যত্বেসতি অনেকবৃত্তিত্ব বলা হতো, অর্থাৎ যদি সমবায় সম্বন্ধ উক্ত লক্ষণে না থাকতো তাহলে অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি হতো। কেননা, ঘটের অত্যন্তাভাব নিত্য কিন্তু সেটি ঘটে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। যেহেতু বৈশেষিক মতে, অভাবস্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে, সমবায় সম্বন্ধে থাকতে পারেনা । এবং 'একম্' পদটি সামান্যের স্বরূপকথন বলেই অনেকে মনে করেন তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

এছাড়া সামান্যের লক্ষণ কেশবমিশ্র বিরচিত তর্কভাষাতেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি সামান্যের লক্ষণে বলেছেন, **'অনুবৃত্তিপ্যত্যয়হেতুঃ সামান্যম্'[৭]।** অর্থাৎ অনুগত প্রতীতি বা একাকার প্রতীতির কারণ হল সামান্য। অনেক ব্যক্তিমানুষে এটা মানুষ, এটা মানুষ এরূপ অনুগত প্রতীতি বা একাকার বুদ্ধির কারণ হল সামান্য। তাহলে এটা পরিষ্কার যে, আনুগত ধর্ম কিছু না থাকলে অনুগত প্রতীতি হতে পারে না। যদিও ব্যক্তি মানুষ রাম, শ্যাম, যদু প্রমুখের মধ্যে নানা প্রভেদ স্পষ্ট, কিন্তু যে আনুগত ধর্মের জন্য নানা প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের মানুষ বলেই জানি তাহল 'মনুষ্যত্ব' নামক আনুগত ধর্ম। এই অনুগত ধর্ম, নানা প্রভেদের মধ্যেও প্রতিটি ব্যক্তি মানুষে অভিন্নভাবে বিরাজমান। যার জন্য আমাদের অনুগত প্রতীতি হয়। অর্থাৎ অনুগত প্রতীতির জন্য আনুগত ধর্ম আব্যশক। আবার অনুগত জ্ঞান না হলে আনুগত ব্যবহারও হয় না। তাছাড়া অনুগত জ্ঞানের জন্য অনুগত বিষয়ও

---

[৭] শ্রী গঙ্গাধর, *শ্রী কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা,* দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৩৩৩।

দরকার । সুতরাং অনুগত ব্যবহারের সাধক যে অনুগত প্রতীতি, সেই অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে যে আনুগত ধর্মকে স্বীকার করতে হয়, সেই অনুগত ধর্মই সামান্য।

২। সামান্যের বিভাগ প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকঃ- সামান্যের লক্ষণ নির্দেশের পর বিভাগের প্রসঙ্গ আসে- প্রশস্তপাদভাষ্যে সামান্যের বিভাগ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, **"সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরং চানুবৃত্তিপ্রত্যয়কারনম্। তত্র পরং সত্তা মহাবিষয়ত্বাৎ, সা চানুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব। দ্রব্যত্বাদ্যপরমল্পবিষয়ত্বাৎ। তচ্চ ব্যাবৃত্তেরপি হেতুত্বাৎ সামান্যং সদ্বিশেষাখ্যামপি লভতে"**[10] ।।৬।। অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার - পর ও অপর। এই সামান্য পদার্থ অনুবৃত্তি জ্ঞানের কারণ। উক্ত দুই প্রকার সামান্যের মধ্যে পর সামান্য সত্তা, যেহেতু তা মহাবিষয়ক অর্থাৎ তার আশ্রয় পদার্থ বহু। আর সেই সত্তা অনুগত জ্ঞানের কারণ বলে সামান্যই। দ্রব্যত্বাদি অপর সামান্য। যেহেতু তা সত্তার তুলনায় অল্পবিষয়ক। আর সেই দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অনুবৃত্তির ও ব্যাবৃত্তি উভয় জ্ঞানের কারণ বলে সামান্য হয়েও বিশেষ আখ্যা লাভ করে । তাই দ্রব্যত্বাদিকে সামান্য বিশেষ বলা হয়।

ন্যায়কন্দলীতে প্রায় অনুরূপভাবেই সামান্যের বিভাগ করা হয়েছে, **"সামান্যং কথয়তি সামান্যং দ্বিবিধমিতি। দ্বৈবিধ্যমেব কথয়তি - পরমপরংচেতি"**[11]। অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার যথা - পর ও অপর। এখানে 'চ' শব্দটি অবধারণ অর্থে- অর্থাৎ 'পর ও অপরই' এরূপ

[10] দণ্ডিস্বামী, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৮৮।

[11] তদেব, ২০০।

অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং পর সামান্য সত্তা, কেননা তা মহাবিষয়ক। আর অপর সামান্য দ্রব্যত্বাদি - যেহেতু তা সত্তাপেক্ষা অল্প বিষয়ক। অর্থাৎ দ্রব্যত্বাদি সামান্য হয়েও বিশেষ। কিন্তু সত্তা নিজের আশ্রয়ের একাকারজ্ঞানের হেতুজন্য সামান্যই হয় বিশেষ হয় না।

প্রায় একই রকমভাবে উপস্কারেও সামান্যকে দ্বিবিধ বলা হয়েছে- **"সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরঞ্চ। তত্র পরং সত্তা অপরং সত্তাব্যাপ্যং দ্রব্যত্বাদি তত্র সামান্যস্য তদ্বিশেষস্য চ লক্ষনং বুদ্ধিরেব। অনুবৃত্তবুদ্ধিঃ সামান্যস্য ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির্বিশেষস্য"**[12]। অর্থাৎ সামান্য দুইপ্রকার পর ও অপর। সেখানে পর সামান্য সত্তা অপেক্ষা সামান্য দ্রব্যাদি ব্যাপ্য। এই পর সামান্য ও অপর সামান্যের ভেদ বুদ্ধি বা জ্ঞানগ্রাহ্য। সামান্যজ্ঞানের হেতু অনুবৃত্তি বুদ্ধি এবং বিশেষজ্ঞানের হেতু ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি। অন্য দিকে পরিষ্কার টীকাতেও সামান্যকে পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়েছে। **'আশয়শ্চয়ং যদি চ সামান্যং পরাপরভেদাদ্দ্বিবিধম্'**[13]। অর্থাৎ সামান্য পরাপর ভেদে দুই প্রকার। আবার প্রায় একই ভাবে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদে সামান্যের দ্বিবিধ বিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন, **"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ"**[14]। অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার যথা পর ও অপর। কেশবমিশ্র তাঁর তর্কভাষাতে সামান্যকে দ্বিবিধ বলেছেন **"... তচ্চ দ্বিবিধং, পরমপরশ্চ। পরং সত্তা**

---

[12] সেখ সাবির, *শঙ্করমিশ্রকৃতঃ বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ*, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৩৪।

[13] তদেব, ২৩৯।

[14] শ্রীমৎ পঞ্চানন, শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্য্যবিরচিতঃ *ভাষা-পরিচ্ছেদঃ* সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিতঃ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৫১।

বহুবিষয়ত্বাৎ। সা চানুবৃত্তিপ্রত্যয়মাত্রহতুত্বাৎ সামান্যমাত্রম্। অপরং দ্রবত্বাদি, অল্পবিষয়ত্বাৎ”[15]। অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার যথা পর ও অপর। এবং পর সামান্য সত্তা যা মহাবিষয়ক ,এবং তা কেবল অনুগত প্রতীতির কারণ হয় তাই সত্তাকে কেবল সামান্য বলা হয়ে থাকে। আর অপর সামান্য হল অল্প বিষয়ক, যেমন দ্রব্যত্ব প্রভৃতি।

অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে পূর্বরীতি মেনে সামান্যকে দ্বিবিধ বলেছেন, যথা- পর ও অপর। যদিও অধ্যাপক নারায়ন চন্দ্র গোস্বামীর মতে, “ কেউ বলেছেন ‘ পরাপর’ নামক তৃতীয় প্রকার সামান্য হয়”। এই তিন প্রকার সামান্যকে অন্যভাবেও বলা যায়, সামান্য, বিশেষ ও সামান্যবিশেষ। যে জাতিটি সর্বব্যাপক তা পর সামান্য, যথা - সত্তা। সত্তা জাতি অপেক্ষা ব্যাপ্য জাতি হল অপর জাতি, যথা - ঘটত্ব। আর যে জাতি অন্য কোন জাতির ব্যাপ্য হয় এবং অপর ভিন্ন কোন জাতির ব্যাপক হয় তাকে পরাপর সামান্য বলে। যেমন - দ্রব্যত্বাদি জাতি সত্তাজাতির ব্যাপ্য আবার পৃথিবীত্ব, জলত্বাদি জাতির ব্যাপক হওয়ায় পরাপর জাতি বলে। কেননা, সত্তা থাকে দ্রব্য, গুন ও কর্মে, আর দ্রব্যত্ব থাকে কেবল দ্রব্যে। সুতরাং সত্তাপেক্ষা দ্রব্যত্বের ব্যাপকতা কম। এমন বিভাগের ভিন্ন কারণও আছে, কেননা - কোন জাতি কেবল আনুগত প্রতীতির কারণ হয়, যথা - সত্তা। আবার কোন জাতি কেবল ব্যাবৃত্তি বা ভেদবুদ্ধিমাত্রের কারণ হয়, যেমন - ঘটত্বাদি। আবার কোন কোন জাতি আনুগত ও ব্যাবৃত্ত উভয় বুদ্ধির কারণ হয়। তাদেরকেই পরাপর সামান্য বা

---

[15] শ্রী গঙ্গাধর, *শ্রী কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা,* দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৩৩৩।

সামান্য বিশেষ বলা হয়। যেমন পৃথিবীত্বাদি জাতি। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, বলা হল ঘটত্বাদি জাতি কেবল ভেদবুদ্ধির সাধক। তাহলে প্রশ্ন জাগে ঘটত্বাদি জাতি কি আনুগত প্রতীতির নিয়ামক হয়না ? আর তা যদি না হয় তাহলে সামান্য গঠিত হয় কি করে ? অয়ং ঘট, অয়ং ঘট এরূপ আনুগত প্রতীতিইতো সামান্যের কারণ। আর যে কেবল ব্যাবৃত্তি বা ভেদ বুদ্ধির নিয়ামকই হয় তাকে অন্ত্যবিশেষ বলে। কিন্তু ঘটত্বাদি অন্ত্যবিশেষ নয় শুধু পর সামান্য সত্তার বিপরীত রূপে বিশেষ। ঘটত্বাদি দ্বারা পটত্বাদির ব্যাবৃত্তি সহজেই হয় বলেই বোধ হয় তাকে বিশেষ বলা হয়েছে।[16]

কিন্তু এবিষয়ে একটা প্রশ্ন, সামান্য যা আনুগত প্রতীতি থেকে পরিস্ফুটিত হয় তা কি জাতির সঙ্গে অভিন্ন ? না সামান্য ও জাতি ভিন্ন ভিন্ন ? কোন কোন মতে সামান্য ও জাতি পর্যায় শব্দ। সামান্যের নামান্তর হল জাতি। তর্কসংগ্রহকারের মতে সামান্য ও জাতি এই দুই শব্দই এক্ষেত্রে বৈশেষিক দর্শনে পর্যায় শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সামানান্যং ভাবঃ সামান্যম্'- এরূপ অর্থে সামান্য শব্দ সাধারণ ধর্ম বোধিত করে। কিন্তু জন্ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে জাতি। যার অর্থ উৎপত্তি। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে ন্যায়- বৈশেষিক দর্শনে জাতি সামান্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কথা হল- জাতি হলে অবশ্যই তা সামান্য হয়, কিন্তু যা সামান্য তা জাতি নাও হতে পারে। এটাই সামান্য ও জাতির প্রভেদ।

---

[16] শ্রীনারায়ণচন্দ্র, *শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ; সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ; অধ্যাপনাসহিতঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৫৩।

নির্বাধক সামান্যই জাতি এবং স্ববাধক সামান্য উপাধি। অর্থাৎ সামান্যকে নির্বাধক ও স্ববাধক অর্থে ভাগ করা যায়। এক্ষেত্রে নির্বাধক সামান্য অর্থাৎ জাতি পূর্বেই আলোচিত হল। এখন আলোচনার পুর্নাঙ্গ রূপ পেতে হলে আমাদের স্ববাধক সামান্য অর্থাৎ উপাধি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। স্ববাধক সামান্য হল কলসত্ব, আকাশত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব, সমবায়ত্ব প্রভৃতি। এগুলি জাতি বিষয় বাধক পরিদর্শিত হওয়ায় স্ববাধক সামান্য বলা হয়। উক্ত স্ববাধক সামান্য সম্বন্ধে উদায়নাচার্য তাঁর কিরনাবলী গ্রন্থে বলেছেন - " **ব্যক্তরভেস্তল্যত্বং সঙ্করোহথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ"**[17]। অর্থাৎ ব্যক্তির অভেদ, তুল্যত্ব, সাঙ্কর্য, অনবস্থা, রূপহানি ও অসম্বন্ধ এগুলিই হল জাতির বাধক। আমরা উক্ত জাতির বাধক নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করবো।

ব্যক্তির অভেদঃ- সাধারণত ব্যক্তির অভেদ বলতে একব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির কোন ভেদ প্রদর্শিত না হওয়াকে বোঝানো হয় , ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ব্যক্তির অভেদ জাতির বাধক রূপেই প্রদর্শিত হয়। সেখানে বলা হয় যে, ধর্মের আশ্রয়ীভূত ব্যক্তি যদি এক হয় তাহলে সেই ধর্ম জাতি হয় না। কেননা জাতির লক্ষণে বলা হয়েছে, জাতি হল অনেক সমবেত ধর্মত্ব। অর্থাৎ অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে সাধারণ ধারণা বর্তমান তাই হল জাতি বা সামান্য। কিন্তু এক ব্যক্তিতে স্বীকৃত ধর্মের সাধারণীকরণ করা সম্ভব নয়। এই জন্য

---

[17] দণ্ডিস্বামী, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০।

আকাশত্ব, কালত্ব যদিও নিত্য কিন্তু আকাশ, কাল এক। উক্ত আকাশ কালাদি বহু নয় বলে তাতে জাতি স্বীকারের প্রসঙ্গ আসেনা।

কিন্তু এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আকাশত্ব, কালত্ব তো জাতির লক্ষণের অন্তর্গতই হয়না। কেননা, জাতির লক্ষণে বলা হয়েছে **'নিত্যত্বেসতি অনেকসমবেতত্বম্'**। কিন্তু আকাশ, কাল ইত্যাদি-তো 'এক', তাহলে এগুলোকে জাতি স্বীকার করে খণ্ডন করার প্রসঙ্গ কিভাবে আসে ? এর উত্তরে মহামহিমোপাধ্যায় রাজেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় বলেছেন যে, সাধারণভাবে ধর্মবাচক শব্দের উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় থাকলে তাকে জাতিরূপে মানা হয়। সুতরাং আকাশত্ব, কালত্বকে সেহেতু জাতি মনে হতে পারে, কিন্তু তা আদৌ যে জাতির লক্ষণ অন্তর্গত নয় তা পূর্বেই 'ব্যক্তির অভেদ' জাতিবাধকে উল্লেখিত হয়েছে।[18]

তুল্যত্বঃ- 'তুল্যত্ব' শব্দের অর্থ হল অন্যূন-অনতিরিক্ত বৃত্তিত্ব। অর্থাৎ দুটি পদার্থ যদি পরস্পর পরস্পরের অন্যূন-অনতিরিক্ত ধর্মের হয় তাহলে সেই ধর্মকে বা সেই ধর্মের অধিকরণ পদার্থ দুটিকে 'তুল্যত্ব' বলা হয়। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে ধর্ম পরস্পর ব্যাপ্য ও ব্যাপক তা সমনিয়ত ধর্ম, আর সমনিয়ত ধর্ম থাকলে তাদেরকে জাতিরূপে স্বীকার করা যায় না। যেমন - কিরণাবলীর প্রকাশটীকাকার দিনকরী তাঁর দিনকরীটীকায় ঘটত্ব ও কলসত্বকে একই জাতি বলেছেন, পৃথক জাতি বলেননি। " কিন্তু দিনকরীর এই

---

[18] শ্রী গঙ্গাধর, *শ্রী কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা*, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৩৪০।

মত সঙ্গত নয়, কেননা 'তুল্যত্ব' এর অর্থ স্বভিন্নজাতিসমনিয়তত্ব হলে, 'স্ব' পদে কলসত্ব কিংবা ঘটত্বকে ধরলে, তার সমনিয়তত্বরূপ তুল্যত্ব ঘটত্ব ও কলসত্ব - এই উভয় থাকায় ঘটত্ব ও কলসত্ব কেউই জাতি হতে পারে না। আবার ঘটত্বকে কলসত্ব হতে ভিন্নরূপে ধরলে ঘটত্ব ও কলসত্ব কখনও এক জাতি হতে পারে না। অতএব স্বপ্রবৃত্তি নিমিত্তক শব্দভিন্ন পর্যায়শব্দ প্রবৃত্তিনিমিত্ত সমনিয়তত্ব রূপ তুল্যত্বকে ভেদের বাধক বলা উচিত"।[19] বার্ত্তিককার জ্ঞান ও বুদ্ধি কে পর্যায় শব্দ বলেন । সুতরাং জ্ঞানত্ব ও বুদ্ধিত্ব সমনিয়তধর্ম হওয়ায় তারা দুটি পৃথক জাতি নয়। স্বভাবতই সমনিয়ত ধর্মদ্বয়ের একটিই জাতি। অর্থাৎ জ্ঞানত্ব বা বুদ্ধিত্ব যেকোনো একটি জাতি স্বীকার করলেই হয়, এর থেকে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তুল্যত্ব জাতির বাধক নয় জাতি ভেদের বাধক । অর্থাৎ তুল্যত্বধর্মদ্বয়ীর যেকোনো একটিতে জাতি স্বীকার করে অন্যটিকে পর্যায় মানা যেতে পারে।

সঙ্করঃ- সঙ্কর শব্দের অর্থ, **'পরস্পরব্যভিচারিত্বে সতি সামানাধিকরন্যম্'**[20] । অর্থাৎ পরস্পর অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ পদার্থদ্বয়ের একত্র স্থিতি হল সঙ্কর। এইরূপ সাঙ্কর্য্যবিশিষ্ট ধর্মকে জাতি বলা যায় না। যেমন - ভূতত্ব ও মূর্তত্ব ধর্মদ্বয়কে এরূপ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায়। বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, ব্যোম হল ভূতদ্রব্য, আবার ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, মন হল মূর্তদ্রব্য। তাহলে এখানে ব্যোম বা আকাশ ভূত দ্রব্য

---

[19] শ্রী গঙ্গাধর, *শ্রী কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা*, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৩৪২।

[20] তদেব, ৩৪২।

সমানাধিকরণে থাকার শর্তেও মূর্ত দ্রব্যাভাব হয়েছে। আবার মন মূর্তদ্রব্য অধিকরণে থাকার শর্তেও ভূতদ্রব্যে সামানাধিকরন্যের অভাবে বর্তমান। কিন্তু ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ভুতদ্রব্যে ও মূর্তদ্রব্যে উভয়ই থাকার জন্য সমানাধিকরণ হয়। অর্থাৎ ভূতত্ব ও মুর্তত্ব পরস্পর সমানাধিকরণ ও পরস্পর অভাবের অধিকরণে থাকার জন্য জাতিরূপে স্বীকৃত নয়। যদিও নব্য নৈয়ায়িকদের মতে সাঙ্কর্যকে জাতিবাধকরূপে স্বীকার করা হয় না । কেননা সাঙ্কর্যকে জাতির বাধক স্বীকার করলে ঘটত্ব, পৃথিবীত্ব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জাতিকে বাধকতার দোষে জাতিরবাধক বলতে হয়। যেমন-সৌবর্ণঘটে পৃথিবীত্ব নেই ঘটত্ব আছে। কিন্তু সৌবর্ণঘটে সুবর্ণত্ব জাতি থাকায় সাঙ্কর্য দোষ অনিবার্য। কিন্তু ঘটত্ব ও সুবর্ণত্ব প্রসিদ্ধ জাতি, জাতির বাধক নয়। দীধিতিকারের মতে ভূতত্ব ও মূর্তত্ব উভয়ই জাতি, যেহেতু আকাশ ও মন অতিরিক্ত দ্রব্য না হওয়ায় ভূতত্ব ও মূর্তত্ব পরস্পরাভাব সমানাধিকরণ হয়না। সুতরাং সাঙ্কর্যের অবকাশই এখানে নেই।[21]

অনবস্থাঃ- অবিশ্রান্ত অপ্রামানিক আপত্তি বা পদার্থ কল্পনাকে অনাবস্থা বলে। অর্থাৎ অবিশ্রান্ত কল্পনা হল অনবস্থা। জাতিতে জাতি স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ হয়। অর্থাৎ কোন জাতি কখনও অপর জাতির ব্যক্তি হতে পারেনা। ব্যক্তি হল জাতির অধিকরণ। জাতি অনুগতধর্ম হওয়ায় জাতিতে জাতি স্বীকার করলে প্রথম জাতি দ্বিতীয় জাতিত্বের ব্যক্তি হয়ে পড়ে। এবং তৃতীয় জাতিত্ব স্বীকার করলে দ্বিতীয়জাতিত্ব তৃতীয় জাতির ব্যক্তি

---

[21] শ্রী গঙ্গাধর, *শ্রী কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা,* দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৩৪৪।

হয়ে পড়ে। সুতরাং অনবস্থা দোষ অনিবার্য হয়। কাজেই জাতিতে জাতি স্বীকার করলে 'অনবস্থা' হয়, যা জাতির বাধক। তবে মনে রাখতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে যদি আমরা একটা বিশেষ অবস্থানে থেমে যাই তাহলে অনবস্থা দোষের হয় না। যেমন, অবয়বীর অবয়ব ধারা চলতে থাকলে তার ব্যাখ্যা কখনো পূর্ণ হবে না এবং অনবস্থা দোষ অনিবার্য। কিন্তু আমারা যদি, পরমাণু স্বীকার করে অবয়বের ধারা থামিয়ে দিই তাহলে ব্যাখ্যা পূর্ণ হয়। ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ তা স্বীকার করেন। এবং সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষের হয় না।

রূপহানিঃ- রূপ বলতে এখানে স্বরূপ বোধিত হয়েছে। যার জাতি স্বীকার করলে স্বরূপের হানি হয় তাকে রূপহানি জাতিবাধক বলে। যেমন-বিশেষ পদার্থের স্বরূপই ব্যার্তকত্বের হেতু। পরমাণু সমূহের ভেদবুদ্ধির জন্য 'বিশেষ' স্বীকৃত। বিশেষ যেমন পরমাণুসমূহের হেতু তেমনি বিশেষান্তরেরও হেতু। কিন্তু বিশেষে বিশেষত্ব জাতি স্বীকার করলে, বিশেষ অনুগত ধর্মের আশ্রয় হওয়ায় স্বতঃব্যাবৃত্তত্ব ধর্মের অনধীকরণ হয়ে পড়ে। কারণ নিয়ম হল সামান্যের আশ্রয় সামান্যরূপেই ভেদের সাধক হয়। বিশেষ বিশেষত্ববিশিষ্ট হলে বিশেষান্তর হতে বিশেষের ভেদ সিদ্ধ না হওয়ায় তা আর পরমাণুর ভেদের কারণ হতে পারে না। এজন্য বিশেষত্বকে জাতি বলা যায় না। আবার বিশেষকে নিঃসামান্য বলা বলা হয় - **'নিঃসামান্যত্বে সতি সামান্যভিন্নত্বেসতি সমবেতত্বম্'** । এরূপ নিঃসামান্য বিশেষ পদার্থে সামান্য স্বীকার করলে বিশেষের স্বরূপের হানি হয়। এজন্যও বিশেষে বিশেষত্ব জাতি স্বীকৃত নয়।

অসম্বন্ধঃ- অসম্বন্ধ বলতে সম্বন্ধের অভাবকে বোঝায়। এক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধের অভাব বোধিত হয়েছে ,জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ হয়। যেখানে সমবায় সম্বন্ধের অভাব থাকে সেখানে জাতি গঠিত হতে পারে না। যে আশ্রয়ে সামান্য সমবেত হয় তা হল সমবায়ের অনুযোগী। আর যা সমবায় সম্বন্ধে ঐ আশ্রয়ে থাকে তা হল সমবায়ের প্রতিযোগী। যেমন- 'রূপবান্ ঘটঃ', এরূপস্থলে রূপ সমবায় সম্বন্ধে ঘটে থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘট এবং ঘটের রূপ এই সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী 'ঘট'। কেননা ঘটে (অধিকরণে) রূপ সমবায় সম্বন্ধে থাকে অর্থাৎ রূপ হল 'রূপবান ঘটঃ' এরূপ সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যা সমবায় সম্বন্ধে থাকে তা অর্থাৎ 'রূপ' হল প্রতিযোগী। এই কারণেই সমবায়ত্ব ও অভাবত্বকে জাতি বলা যায় না। কেননা সমবায় ও অভাব একে অপরের সঙ্গে কেউ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। আবার সমবায়ে বা অভাবে কেউ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। ফলে সমবায় বা অভাব কেউই কোন পদার্থের অনুযোগী হয় না। আবার সমবায় বা অভাব পদার্থ কোন পদার্থে বা কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। ফলে সমবায় বা অভাব কারোর প্রতিযোগীও হয় না। আর যেখানে অনুযোগী ও প্রতিযোগী সম্বন্ধ থাকে না সেখানে অর্থাৎ সমবায় বা অভাবে জাতি স্বীকার করা যায় না। আর সমবায় ও অভাব পরস্পরের সঙ্গে কেউই অনুযোগী বা প্রতিযোগী সম্বন্ধে না থাকায় তারা পরস্পর জাতিও হতে পারে না। আসলে সমবায় ও অভাব পরস্পর স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে নয়। তাই সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব জাতি নয়, জাতির বাধক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মীমাংসা দর্শনে সামান্য

১। সামান্যের আলোচনার উৎপত্তি প্রসঙ্গে মীমাংসা দর্শনঃ– মীমাংসা মতে সমস্ত বস্তু হয় প্রমেয় অথবা প্রমাণ পদার্থের অন্তর্গত। তাঁরা মনে করেন যে, প্রমাণ হল প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের করণ এবং প্রমেয় হল যথার্থ জ্ঞানের বিষয়। এবং প্রমেয়ভূত মূল বিষয়কে বলা হয় পদার্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী মীমাংসকরা প্রধানত বেদের প্রামান্য বা স্বতঃসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দার্শনিক বিচারের আওতায় এসে ভাববাদ খণ্ডনে বাহ্যবস্তুবাদী ন্যায়-বৈশেষিকদের মতো যেমন প্রমাণতত্ত্বের নানা মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন ও বিচার করেছেন, তেমনি তাঁরা প্রমেয়ভাবে ন্যায়-বৈশেষিকদের বাহ্যবস্তুবাদসম্মত বহির্জগতের ব্যাখ্যাও বহুলাংশেই গ্রহণ করেছেন। এ কারণে তাঁরা যা কিছু মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত হয় সেসবের শ্রেণীবিন্যাস করার পাশাপাশি বৈশেষিকদের পরমাণুবাদও গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।[1]

---

[1] https://horoppa.wordpress.com/2013/05/31/6014-mimamsa-philosophy-12-categories/

উপলব্ধির বিষয় হিসাবে বহু বস্তু প্রতীতি হয় যাকে ন্যায় বৈশেষিকরা পদার্থ নামে অভিহিত করেছেন। যা জ্ঞেয়, প্রমেয় ও অভিধেয় তাই পদার্থ। বৈশেষিকরা উক্ত পদার্থকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করেন, যথা - (ক) ভাব পদার্থ ও (খ) অভাব পদার্থ। (ক) ভাব পদার্থের মধ্যে পড়ে ছয় প্রকারের পদার্থ, যথা- দ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। (খ) এবং অভাব পদার্থ। জৈমিনির মীমাংসাসূত্রে পদার্থের উল্লেখ নেই। যদিও শবরভাষ্যে (১০/৩/৪৪) দ্রব্য, গুন, কর্ম ও অবয়বের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় তিনি চার প্রকার পদার্থ স্বীকার করেন।[2] তবে তাঁর কাছে পদার্থের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ নাহলেও পরবর্তী মীমাংসা দার্শনিক প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্ট বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিকদের সাথে সহমত পোষণ করেন। ফলে পদার্থতত্ত্ব তাঁদের কাছে গুরুত্ব পায়। তবে বাহ্যজগতের বস্তুগুলি ঠিক কয়টি পদার্থের অন্তর্গত হবে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রভাকরের মতে প্রমেয় পদার্থ আট প্রকারের। যথা - দ্রব্য, গুন, কর্ম, জাতি বা সামান্য, সমবায়, শক্তি, সাদৃশ্য এবং সংখ্যা। এবং কুমারিল ভট্টের মতে পদার্থ পাঁচ প্রকারের। যথা - দ্রব্য, গুন, কর্ম, জাতি বা সামান্য এবং অভাব। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল মীমাংসকদের জাতি বা সামান্য নামক পদার্থ নিয়ে।

---

[2] https://horoppa.wordpress.com/2013/05/31/6014-mimamsa-philosophy-12-categories/

২। সামান্য প্রসঙ্গে মীমাংসা ও ন্যায়-বৈশেষিকঃ- মীমাংসা দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিকদের মতোই সামান্যকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করা হয়। এবং সামান্যকে উভয় সম্প্রদায় স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিষয় বলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সামান্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক দিকে নৈয়ায়িকরা মনে করেন যে, সামান্য বহু এবং প্রতিটি সামান্য গঠিত হয় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সমান ধর্ম সম্পন্ন অনেক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু নিয়ে। কাজেই সামান্য একটি সমগ্রের ধারণা এবং বিশেষ নিয়েই সামান্য গঠিত হয়। নৈয়ায়িকরা মনে করেন যে, সামান্য নিত্য এবং অনেকে সমবেত **(নিত্যতে সতি অনেকে সমবেত্বম্ সামান্যম্),** এবং বিশেষ অনিত্য। তাহলে প্রশ্ন হল বিশেষ না থাকলে সামান্য কোথায় অবস্থান করে ? এবিষয়ে তাঁরা বলেন যে, বিশেষ না থাকেল সামান্য কালে অবস্থান করে। তবে এক্ষেত্রে সামান্য নিত্য এবং বিশেষ অনিত্য হওয়ায় তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মীও বিষয়ে পরিণত হয় । কাজেই এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল উক্ত অবস্থায় অর্থাৎ সামান্য নিত্য ও বিশেষ অনিত্য হওয়ায় তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব কি করে ? নৈয়ায়িকরা উক্ত বিশেষ ও সামান্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করেন। মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিকসূত্রের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সমবায়ের লক্ষন নির্দেশ করে বলেন, **'ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ'(বৈঃ সূঃ ৭।২।২৬)**।[3] অর্থাৎ কার্য ও

[3] দণ্ডিস্বামী, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২৫২।

কারণের, অকার্য ও অকারণের মধ্যেও 'এই আধারে এই আধেয় থাকে বা আছে' এইরূপ যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে সম্বন্ধ তাই সমবায়।

কিন্তু উক্ত লক্ষণকে আরও স্পষ্ট করে প্রশস্তপাদাচার্য তাঁর প্রশস্তপাদভাষ্যে বলেন, ' **'অযুতসিদ্ধানামাধার্যধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ- প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ'।। ৮।।** অর্থাৎ আধার ও আধেয় স্বরূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থগুলির 'ইহপ্রত্যয়' অর্থাৎ এই আধারে এই আধেয় আছে এই প্রকার জ্ঞানের কারণীভূত যে সম্বন্ধ তাই সমবায়।।৮।। অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ বলতে বোঝায়, **'অসম্বন্ধয়োরবিদ্যমানতবম্ অযুতসিদ্ধঃ'**[4] অর্থাৎ অসম্বন্ধপদার্থদ্বয়ে অবর্তমানই অযুতসিদ্ধির স্বরূপ। যেমন বৃক্ষে বানরের যে সংযোগ তা পূর্বেই অসম্বন্ধভাবে ছিল বা থাকতে পারে। তাই উক্ত বানর ও বৃক্ষের সম্বন্ধ অযুতসিদ্ধ থাকল না। তা যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ। কিন্তু সূত ও সূত দ্বারা গঠিত গামছার সম্বন্ধ হল অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ। কেননা তা অপৃথকসিদ্ধ। যদি উক্ত সম্বন্ধ থেকে সূতকে পৃথক করা হয় তাহলে গামছার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হয়। এইরূপ ন্যায় বৈশেষিক মতে দ্রব্য ও গুন; দ্রব্য ও কর্ম; দ্রব্য ও জাতি; গুন ও জাতি; কর্ম ও জাতি; অবয়ব ও অবয়বী; নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ এদের সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। সুতরাং এভাবে দ্রব্য ও জাতি; গুন ও জাতি; কর্ম ও জাতি; নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ এর সম্বন্ধের দ্বারা ন্যায় বৈশেষিকরা বিশেষ ও সামান্যের মধ্যে সম্বন্ধকে উল্লেখ করেন।

---

[4] তদেব, ২৫২।

৩। সামান্য প্রসঙ্গে প্রভাকর ও কুমারীল মতঃ– কিন্তু মীমাংসকরা এপ্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ভাট্ট মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কুমারীল ভট্টের মতে সামান্য ও বিশেষের মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই। যাকেই সামান্য তাকেই বিশেষ বলা হয়। তিনি সামান্য ও বিশেষের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। যদিও উক্ত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অদ্বৈতবেদান্তের চরম একত্ব (Absolute Identity) নয়।[5] আচার্য্য শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম হল প্রকৃতসৎ এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোন প্রকারের ভেদ স্বীকৃত নয়। যদিও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জাগতিক ভেদ স্বীকৃত। কিন্তু কুমারিল এর মতে ভেদ ও অভেদ দুইই অভিজ্ঞতায় পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ভেদ সহিষ্ণু অভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকরা সামান্যকে ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ বলে মনে করেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হল, যদি আমরা মনে করি যে ব্যক্তি মানুষ মনুষ্যত্ব নামক সামান্য ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহলে সে প্রসঙ্গে আমাদের জ্ঞান হতো 'এটা একটা মানুষ' এবং 'ওটা মানুষ থেকে ভিন্ন একটি পদার্থ মনুষ্যত্ব'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের তা মনে হয় না। আমরা যখন মানুষ প্রত্যক্ষ করি তখন মনুষ্যত্বের ধারণা ছাড়া কেবল ব্যক্তি মানুষ প্রত্যক্ষ করি না। প্রত্যক্ষ করি ব্যক্তি মানুষ এবং একই সাথে মানুষের সাধারণ ধারণা। মীমাংসক মতে এটা আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের একটা ভ্রম যে, ব্যক্তি মানুষ ও মনুষ্যত্ব সামান্যকে ভিন্ন করে দেখা। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের কাজ হল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই প্রত্যক্ষ করা। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি উভয় প্রত্যক্ষের কারণ। এই আনুবৃত্তি নির্ভর করে বস্তুর সাধারণ

[5] Sushanta, *A Study of Universals*, Ressearch Publications Committee, 31.

ধারণার ওপর । এবং এটা মানুষ, গরু নয় এমন জ্ঞান হয় ব্যাবৃত্তির জ্ঞানের জন্য। কাজেই আমরা একই সাথে ভেদ ও অভেদ এর জ্ঞান লাভ করি। এই অর্থেই মীমাংসকরা ভেদ সহিষ্ণু অভেদ তত্ত্বের কথা বলেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে নৈয়ায়িকরা আপত্তি করতে পারেন যে, একই বস্তুতে একই সাথে ভেদ ও অভেদ এমন দুটি ভিন্ন গুণ থাকা কি করে সম্ভব ? কেননা সেটি স্ববিরোধী হয়। এবং উক্ত সমস্যার নিরসন হতে পারে যদি সামান্য ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয় এবং তাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। ভাট্ট মীমাংসকরা অবশ্য উক্ত স্ববিরোধীতার ধারণাকে অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে, যখন কোন একটা যুক্তি ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে বিরোধ বাধে তখন আমরা বাস্তব ঘটনাকেই মান্যতা প্রদান করি এবং একই বস্তু বা ব্যক্তিতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধারণা উৎপন্ন হলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করি ধারণার আপেক্ষিকতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যেমন- দেবদত্ত জ্ঞানদত্তের থেকে লম্বা কিন্তু বিশ্বদত্তের থেকে বেঁটে। এক্ষেত্রে লম্বা ও বেঁটে দুটি পরস্পর বিরোধী গুণ একই ব্যক্তি দেবদত্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য হচ্ছে কিন্তু এক্ষেত্রে কোন স্ববিরোধীতার সৃষ্টি হয় না।

অন্যদিকে কুমারীল ভট্ট মনে করেন যে, জাতি যে ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় তা জাতি ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। এটা আমারের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার যে, কোন্‌টিকে আমরা জাতি বলব

আর কোন্‌টিকে ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সারসত্তার দিক থেকে তারা একই প্রকৃতির। (But in essence they are identical in nature)[6]।

এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক সুশান্ত সেন আরও মনে করেন যে, "It should be noted here that Kumarila's view of jati is similar to that held by the Samkhya - Joga system."[7] অর্থাৎ কুমারীল ভট্টের জাতি সম্পর্কিত মতের সঙ্গে সাংখ্য ও যোগ দর্শনে জাতি সম্পর্কিত মতের অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। **(সামান্য বিশেষ সমুদয়ঃ দ্রবম্‌ - যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য)** আসলে যখন আমরা 'জাতি ব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন' এই মত পোষণ করি বা এভাবে ব্যক্তিকে দেখি তখন 'ব্যক্তি' আমাদের চেতনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাৎ 'ব্যক্তি জাতির সঙ্গে অভিন্ন' এমন মত পোষণ করি তখন 'জাতির' চিন্তাই আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হয়, এবং ব্যক্তির চিন্তা গৌণ হয়ে পড়ে। কাজেই কোন বস্তু ব্যক্তি না জাতি তা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু নৈয়ায়িকরা উক্ত মত খণ্ডন করে বলেন যে, একই সাথে মিল ও অমিল একই বস্তু সম্বন্ধে সম্ভব নয়। কেননা আমরা যখন সামান্য ও বিশেষ এর মধ্যে পার্থক্য প্রত্যক্ষ করি তখন তা ভিন্নরূপেই জানি। আর যখন সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করি তখন হয় তা সামান্য

---

6 Sushanta, *A Study of Universals*, Ressearch Publications Committee, 33.

7 Ibid, P-31.

অথবা তা বিশেষ, কিন্তু একই সাথে আমরা সামান্য ও বিশেষ প্রত্যক্ষ করি না। তাছাড়া একক বস্তুর প্রসঙ্গে সাদৃশ্যের প্রসঙ্গই আসে না। আবার তা একই সঙ্গে সামান্য ও বিশেষ হতে পারে না। সুতারাং এক্ষেত্রে একত্রে সামান্য ও বিশেষ একই বস্তুতে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।

আবার ভিন্ন একটি ক্ষেত্রে নৈয়ায়িক ও প্রাভাকর মীমাংসকদের সামান্য স্বীকৃতি বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। সামান্যের বিভাগ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদভাষ্যে সামান্যের বলা হয়েছে, **"সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরং চানুবৃত্তিপ্রত্যয়কারনম্। তত্র পরং সত্তা মহাবিষয়ত্বাৎ, সা চানুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব। দ্রব্যত্বাদ্যপরমল্পবিষয়ত্বাৎ। তচ্চ ব্যাবৃত্তেরপি হেতুত্বাৎ সামান্যং সদ্বিশেষাখ্যামপি লভতে"[৪] ।।৬।।** অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার - পর ও অপর। এই সামান্য পদার্থ আনুবৃত্তি জ্ঞানের কারণ। উক্ত দুই প্রকার সামান্যের মধ্যে পর সামান্য সত্তা, যেহেতু তা মহাবিষয়ক অর্থাৎ তার আশ্রয় পদার্থ বহু। আর সেই সত্তা আনুগত জ্ঞানের কারণ বলে সামান্যই। দ্রব্যত্বাদি অপর সামান্য। যেহেতু তা সত্তার তুলনায় অল্পবিষয়ক। আর সেই দ্রব্যত্ব প্রভৃতি আনুবৃত্তির ও ব্যাবৃত্তি উভয় জ্ঞানের কারণ বলে সামান্য হয়েও বিশেষ আখ্যা লাভ করে। তাই দ্রব্যত্বাদিকে সামান্য বিশেষ বলা হয়। কিন্তু প্রাভাকর মীমাংসকরা তা অস্বীকার করেন। তাদের মতে সকল বস্তুই সৎ। কেননা প্রতিটি বস্তু তার

---

[৪] দণ্ডিস্বামী, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৮৮।

নিজ নিজ স্বরূপের জন্য স্বতন্ত্র ও অস্তিত্বশীল। তা সামান্য ধর্ম স্বীকারের জন্য নয়। কাজেই মীমাংসা মতে সামান্যের প্রভেদ স্বীকৃতি অপ্রয়োজনীয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অদ্বৈতবেদান্তেও এমন কোন পর সামান্য স্বীকার করা হয় না। তাঁদের মতে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই হল সর্বোচ্চ সত্তা। মায়া দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন উপাধির জন্য উক্ত অপর সামান্যের ভ্রম আমাদের হয়ে থাকে। অদ্বৈতবেদান্ত মতে জাগতিক বিশেষ বিশেষ বস্তু মায়া দ্বারা সৃষ্ট উপাধি বা ভ্রম মাত্র। যার ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক ব্রহ্ম ছাড়া কোন কিছুই সৎ নয়।

৪। সামান্যে প্রসঙ্গে নারায়ন ভট্টের মতঃ– মানমেয়োদয় গ্রন্থে নারায়ন ভট্ট জাতির লক্ষণে বলেন-**"জাতির্ব্যক্তিগতা নিত্যা প্রত্যক্ষজ্ঞানগোচরা। ভিন্নাভিন্না চ সা ব্যক্তেঃ কুমারিলমতে মতা"**[9]।। অর্থাৎ জাতি ব্যক্তিতে অবস্থিত নিত্য ও প্রত্যক্ষের বিষয়। জাতি ও জাতিমান্ এই উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপস্থিত আছে। কুমারিল মতে ব্যক্তি জাতি থেকে ভিন্নও নয় আবার অভিন্নও নয়।

যদিও বৌদ্ধরা সামান্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। এবং তাঁরা বলেন মণির মালায় যেমন সব মণি এক সূত্রে গ্রথিত থাকে। ফলে প্রত্যেক মণিতে এক সূত্রের সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। যদিও সব মণিই পরস্পর সতন্ত্র। তাদের মধ্যে একত্রিতের সম্বন্ধ তৈরি করে উপস্থিত

[9] C. Kunhan and S.S Suryanarayana, *Manameyodaya of Narayana*, The Adyak Library and Research Centre, 233.

সূত। সেইরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তি গুলির মধ্যে কোন একাকার সম্বন্ধ উপস্থিত না থাকায় কোন অনুগত ধর্মের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সামান্য নামক কোন পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধ মতে এই জগত গঠিত হয় বিভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু বিশেষ দ্বারা। যাদেরকে বৌদ্ধরা 'স্বলক্ষন' বলেছেন। বৌদ্ধ মতে সাধারণত সাদৃশ্য, সম্বন্ধ বা সামান্যের ধারণা গঠিত হয় একই রকম ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে মিল কল্পনা করার মাধ্যমে, যেটা আমাদের বুদ্ধি করে থাকে। যেটা বৌদ্ধ ভাষায় 'কল্পনা'। যদি তর্কের খাতিরে সামান্য স্বীকার করা হয়, তাহলে প্রশ্ন হল, তা কি সমগ্র ব্যক্তিতে অবস্থান করে ? না ব্যক্তি বিশেষে অবস্থান করে ? প্রথম বিকল্প স্বীকৃত নয়। কেননা আমরা সামান্যের জ্ঞান একক ভাবে পাই না কেননা যারা সামান্য স্বীকার করেন তাদের মতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ ধর্মের প্রত্যক্ষ করে সামান্য গঠিত হয়। কিন্তু সামান্য যদি সমগ্র ব্যক্তিতে অবস্থান করত তাহলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ ধর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে সামান্য গঠিত হতো না। আবার সামান্য ব্যক্তি বিশেষে অবস্থান করে এও বলা যায় না। কেননা তা যদি হতো তাহলে সামান্য ব্যক্তি সাপেক্ষ হয়ে যেত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে আর সামান্য গঠিত হতো না। অথবা এও বলা যায় না যে বিশেষের উৎপত্তির সময় সামান্যের উৎপত্তি হয়। কেননা কুমারিল মতে সামান্য নিত্য । তাছাড়া সামান্যের উপস্থিতিই অবলুপ্ত হতো। কেননা বিশেষের উৎপত্তির সময় সামান্যের উৎপত্তি হলে নিশ্চয়ই বিশেষের বিনাশের সময় তা বিনাশপ্রাপ্ত হতো।

এর উত্তরে মীমাংসকরা বলেন যে, উভয় মতকেই গ্রহণ করা যায়। কেননা যখন সামান্যকে বিশেষের সমগ্র অংশে স্বীকার করা হয় তখন স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই। এবং প্রতিটা বিশেষ স্বপ্রকাশ বলে বিভিন্ন বিশেষের মধ্যে সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে সামান্য স্বীকারের প্রয়োজন নেই। আবার মীমাংসকরা বৌদ্ধদের প্রতি প্রশ্ন করেন যে, যদি সামান্য বা কোন শ্রেণীগত কোন ধারণা না থাকে তাহলে আমরা কীভাবে একটি গরু থেকে একটি মহিষের পার্থক্য বুঝতে পারি? এপ্রসঙ্গে বৌদ্ধরা বলেন যে, কতকগুলো গরুকে দেখেই আমরা তা গরু বলি। কিন্তু এটা যে গরু তার জ্ঞান সাধারণ ধর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে হয় না, অন্যান্য অগরুব্যাবৃত জ্ঞান থেকেই হয়। অর্থাৎ যখন আমরা গরু প্রত্যক্ষ করি তখন এটা গরু ভিন্ন অন্য কিছু নয় এও প্রত্যক্ষ করি। এভাবেই গরুর আনুগত প্রতীতি উৎপন্ন হয়, সামান্য ধর্ম স্বীকারের জন্য নয়। অর্থাৎ বৌদ্ধরা বিধিমুখে নয়, নিষেধমুখেই এক জাতীয় বস্তুর জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী। জাতি সম্পর্কিত বৌদ্ধদের উক্ত মতবাদকে 'অপোহবাদ বলে'।[10] 'অপোহ' বলতে বোঝায় তৎভিন্নের পরিত্যাগ। এপ্রসঙ্গে মীমাংসকরা বলেন যে, কোনকিছুর নেতির নেতি সদর্থক ভাবনাই গড়ে তোলে। যেমন- যখন আমরা গোত্বের ধারণা অ-গরু ব্যবৃতি দ্বারা বুঝি তখন আমরা প্রকৃত পক্ষে যদি অ-গরুর অ-গরু বলি তখন অর্থাৎ নিষেধের নিষেধ বলি তখন কিন্তু

[10] C. Kunhan and S.S Suryanarayana, *Manameyodaya of Narayana*, The Adyak Library and Research Centre, 237.

উক্ত ধারণা আবার সদর্থক হয়ে যায়। সুতরাং সামান্যের ধারণা নিষেধমুখে নয় বিধিমুখেই গড়ে ওঠে।

আবার মীমাংসকরা প্রশ্ন তোলেন যে, সামান্য কি বিশেষের সঙ্গে অভিন্ন না ভিন্ন ? প্রথমত অভিন্ন বলা যায় না। কেননা তাহলে সামান্যের অনস্তিত্বে বিশেষ অস্তিত্বশীল হতে পারবে না। কিন্তু তা হয় না। আমরা একব্যক্তিক বিশেষ পূর্বেই দেখেছি। আবার সামান্য থেকে বিশেষকে সম্পূর্ণ ভিন্নও বলা যায় না। কেননা গোত্বের সঙ্গে গরুর সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ আসে, ঘোড়ার সঙ্গে গোত্বের নয়। তাহলে সামান্যের সঙ্গে বিশেষ ভিন্ন ও অভিন্ন উভয় বলতে হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে, পরস্পর বিরোধী ধারণা একত্রে স্বীকৃত হয় কি করে ? এর উত্তরে মীমাংসকরা বলেন যে, আমরা যখন বলি 'এটি একটি গরু' তখন 'এটি' এই শব্দ দ্বারা বিশেষকে স্বীকার করা হয় এবং 'গরু' শব্দ দ্বারা সামান্যকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু যদি জাতি ও ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো তাহলে আমাদের প্রত্যক্ষিত হত 'এটি' এবং 'গরু'। যেমন, আমাদের প্রত্যক্ষিত হয় বই ও জল যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী বস্তু। আবার সম্পূর্ণ অভেদ রূপে প্রত্যক্ষিত হতে পারত, 'কর' ও 'হস্ত' শব্দের মতো, যারা ভিন্ন উচ্চারিত সমার্থক শব্দ। কিন্তু 'এটি একটি গরু' এই শব্দটি তেমন প্রকৃতির নয়। ফলত সামান্য ও বিশেষ প্রসঙ্গে ভেদ ও অভেদ একত্রে বলা যেতে পারে বলে মীমাংসকরা মনে করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ ও জৈন মতে সামান্য

১। সামান্য প্রসঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা ও বৌদ্ধঃ- যদিও ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসক উভয় মতে সামান্য একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, যা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক জাতীয় ধর্মের উপস্থিতির ফলে, সামান্যীকরণের মাধ্যমে গঠিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধ মতে, এমন কোন সামান্য পদার্থ ব্যক্তি অতিরিক্ত ভাবে উপস্থিত থাকে না। তাঁরা বলেন যে, মণির মালায় যেমন সব মণি এক সূত্রে গ্রথিত থাকে। এবং প্রত্যেক মণিতে এক সূত্রের সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। যদিও সব মণিই পরস্পর সতন্ত্র, কিন্তু তাদের মধ্যে একত্রের সম্বন্ধ তৈরি করে উপস্থিত সূত। সেইরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তি গুলির মধ্যে কোন একাকার সম্বন্ধ উপস্থিত না থাকায়, কোন অনুগত ধর্মের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সামান্য নামক কোন পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধ মতে, এই জগত গঠিত হয় বিভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু বিশেষ দ্বারা। যাদেরকে বৌদ্ধরা ‘স্বলক্ষন’ বলেছেন । বৌদ্ধ মতে, সাধারণত সাদৃশ্য, সম্বন্ধ বা সামান্যের ধারণা গঠিত হয়, একই রকম ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে মিল কল্পনা করার মাধ্যমে, যেটা আমাদের বুদ্ধি করে থাকে। যেটিকে বৌদ্ধ ভাষায় ‘কল্পনা’ বলে । সদার্থক ভাবে বৌদ্ধ মতে, সৎ হল তাই যার অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকে। অর্থাৎ যা কার্যক্ষম যুক্ত। এবং

নেতিবাচক অর্থে সৎ বলতে বৌদ্ধরা বোঝেন যে, যা নির্বিকল্পক তা অর্থাৎ যা ধারণাগতভাবে সুগঠিত নয়। যেটিকে অনেকে জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায় বলে মনে করেন। অনেকে যাকে সংবেদন বলে মনে করেন। আবার কোন কোন দার্শনিকদের মতে, নির্বিকল্পক জ্ঞান হল তাই যেখানে আমাদের কোন একটা বিষয়ের একটা প্রাথমিক স্বজ্ঞা (Primary Intuition) উৎপন্ন হয়, কিন্তু তা যথার্থ অর্থে জ্ঞান নয়। যদিও বৌদ্ধ মতে, নির্বিকল্পক জ্ঞানই যথার্থ অর্থে জ্ঞান, কেননা সেখানে কোন কল্পনার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। এই কারণে আচার্য ধর্মকীর্ত্তি তাঁর 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থে বলেছেন যে, কল্পনা রহিত অভ্রান্ত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। এবং সেটি হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। এবং উক্ত নির্বিকল্পক জ্ঞানের সাথে আমাদের কল্পনা যুক্ত হয়ে যে ধারণা গঠিত হয়, তাই হল আমাদের বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান। এই কারনেই বৌদ্ধ মতে, বাহ্য জগত সম্পর্কিত জ্ঞান যথার্থ অর্থে জ্ঞান নয়, কেননা, সেখানে ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন কল্পনা মিশ্রিত হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং আমরা জানি নির্বিকল্পক জ্ঞান হল নিস্প্রকারক জ্ঞান। যেখানে বিশেষকে বিশেষ রূপেই জানি এবং বিশেষণকে বিশেষণ রূপে জানি, কিন্তু তাদের সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ বস্তুর স্বলক্ষণের জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। এই জন্য বৌদ্ধ মতে, স্বলক্ষণের জ্ঞান হল যথার্থ অর্থে জ্ঞান। কেননা সেক্ষেত্রে কল্পনার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকেনা। এবং উক্ত স্বলক্ষণের জ্ঞান একক্ষণ স্থায়ী। আর তার পরের ক্ষণেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং একই রকম অন্য বস্তু দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন হয়, যেটি দেখতে ঐ পূর্বের বস্তুর মতো হলেও সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। এই যে কোন বস্তুর এক ক্ষণ স্থায়িত্ব তাকে বৌদ্ধ দর্শনে ক্ষণিকবাদ বলে।

কিন্তু উক্ত ক্ষণকে বৌদ্ধরা স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে কোন কালরূপে (Time) স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, একক স্বতন্ত্র সৎ বস্তুই হল 'ক্ষণ'। যেটিকে কোন এক বিন্দুর সাথে তুলনা করা যায়। এই একক্ষণকেই বৌদ্ধরা যথার্থ অর্থে সৎ বলেছেন। কারণ সেখানে কোন মনের কল্পনা প্রবেশ করতে পারে না।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, বৌদ্ধমতে আমাদের দৈনন্দিন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগত, জাগতিক বিভিন্ন বিষয় যথা - ঘট, পট, মানুষ, গরু প্রভৃতি ব্যক্তি বা বস্তু প্রকৃত অর্থে সৎ নয়। সেখানে ব্যক্তি মানুষের কল্পনা যুক্ত হয়েই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। উক্ত প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুজগতের মূল উৎস হল কল্পনারহিত ক্ষণিক বস্তু, যার জ্ঞান হয় নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্বারা। এবং কোন সাধারণ ধারণা গঠিত হয় উক্ত বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশের ভিত্তিতে। নাম রূপ যুক্ত জাগতিক প্রতিটা বস্তুই বৌদ্ধ মতে সামান্য। কেননা, সেখানে যেমন সৎ বস্তুর কল্পনা, তেমনি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অর্থাৎ আমারা যাদেরকে সামান্য বলি, বৌদ্ধ মতে তা সৎ ক্ষণিক পদার্থ ও ব্যক্তি কল্পনাযুক্ত বস্তু। অর্থাৎ তা একই সঙ্গে সৎ ও অসৎ। এবং সামান্য ও বিশেষ আসলে একে অপরের নিষেধের ফলে সৃষ্ট শব্দযুগল। যেমন বিশেষ যদি হয় নির্বিকল্পক তাহলে সামান্য হবে কল্পিত বা স্ববিকল্পক, বিশেষ যদি হয় অকৃত্রিম তবে সামান্য হবে কৃত্রিম, বিশেষ অনারপিত কিন্তু সামান্য আরোপিত, বিশেষ স্বলক্ষণ কিন্তু সামান্য সামান্যলক্ষণ, বিশেষ স্বতোব্যাবৃত কিন্তু

সামান্য অব্যাবৃত, বিশেষ দেশ-কাল অনুগত কিন্তু সামান্য দেশ-কাল অননুগত, বিশেষ হল পারমার্থিক সৎ কিন্তু সামান্য হল সংবৃতিসৎ, বিশেষ নিরাকার কিন্তু সামান্য সাকার প্রভৃতি।

কিন্তু এবিষয়ে একটা প্রশ্ন হল, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট ক্ষণিক বা ক্ষণ কীভাবে আমাদের মনে সমধর্ম বিশিষ্ট সাধারণ ধারণার সৃষ্টি করে ? আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের মধ্যে নানা বৈসাদৃশ্য থাকা সত্বেও কোন না কোন একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকে, যার জন্য আমরা মানুষ শ্রেণীকে অন্যান্য শ্রেণী থেকে পার্থক্য করতে পারি। তাহলে সেটি কি শুধুই আমাদের মানসিক ভ্রম ? না বাস্তবিক সামান্যকে আমাদের না স্বীকার করে উপায় নেই ? যদিও এবিষয়ে বৌদ্ধদের মত হল যে, এমন কোন সাধারণ ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সেটি নিছক ভ্রম, কেননা তার কোন বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা আমরা এটাই ভাবি যে, যেহেতু বিভিন্ন এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত, সেহেতু সামান্য বলে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ কার্য কারণ সম্বন্ধের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে কারণ হল, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একজাতীয় সাদৃশ্য বর্তমান সেহেতু, কার্য হিসাবে একই সদৃশ সামান্য পদার্থ স্বীকার করতে হয়। যদিও বৌদ্ধ মতে, এটাই আমাদের ভ্রম। কিন্তু একটি কথা হল, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী পদার্থের মধ্যে কখনই কিন্তু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সাদৃশ্য খোজা হয় একজাতীয় বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে। তাহলে যদি কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে না থাকে, তাহলে আমরা বিভিন্ন জাতীয় বস্তু বলবো কি করে ? কাজেই সমধর্মীও বিষয়কে সম্পূর্ণ ভ্রম বলা

কি যথোচিত ? এবিষয় নিয়ে যদিও তর্কের অবকাশ নেই। এখন আমরা সামান্য বিষয়ে বৌদ্ধদের মত সবিস্তারে আলোচনা করবো।

বৌদ্ধমতে, আমরা যেটাকে প্রত্যক্ষ বলি সেটি আসল প্রত্যক্ষ নয়। কেননা, তাতে কল্পনা যুক্ত থাকে। আমাদের মানসিক নানা অনুভুতি মিশ্রিত হয়ে কোন বিষয় প্রত্যক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যক্ষ হল **'কল্পনাপড়ং অভ্রান্তং প্রত্যক্ষম্'**[1]। বৌদ্ধ মতে, আমরা যখনই কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন উক্ত বিষয়কে নতুন ভাবে জানি, যতবার দেখি ততবার তা নতুন রূপেই দেখি, অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে নতুনত্ব থাকে। কেননা, সেখানে ব্যক্তির নানা ধারণার প্রয়োগ হয়, নানা কল্পনা মিশ্রিত হয়েই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং সেদিক থেকে দেখতে গেলে, কোন বিষয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞানই যথার্থ অর্থে জ্ঞান। অর্থাৎ এবং ক্ষণিক জ্ঞানই যথার্থ। কোন বিষয়ের ক্রমাগত জ্ঞান যখন হয়, তখন বিষয়ের তুলনায় বিষয়ীর প্রভাব উক্ত জ্ঞানে আরোপিত হয়। এই কারণে বৌদ্ধ মতে, ক্ষণিক জ্ঞানই যথার্থ অর্থে জ্ঞান। সুতরাং এই অর্থে বৌদ্ধমতে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই যথার্থ অর্থে প্রত্যক্ষ। কেননা, তা ব্যক্তি কল্পনারহিত বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ। এবং তারা সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে বস্তুর যথার্থ প্রত্যক্ষ বলেন না। কেননা, সেখানে ব্যক্তি কল্পনা যুক্ত হয়ে সাধারণীকরণের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন- আমরা যখন বলি, এটি একটি মানুষ তখন সেখানে 'এটি' হল প্রকৃত অর্থে নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং তা ভাষায় বর্ণনা করা যায়

[1] সত্যজ্যোতি, *ধর্মকীর্ত্তি রচিত ন্যায়বিন্দু*, সাহিত্যশ্রী, ১২।

না। অর্থাৎ নির্দেশক অর্থে (Denotative Meaning) আমরা যখন উক্ত মানুষটিকে নির্দেশ করবো, তখন সেটিই প্রকৃত অর্থে উক্ত ব্যক্তি মানুষটিকে বোঝাবে। কিন্তু আমরা যখন সেখানে ভাষা প্রয়োগ করবো, তখন সেখানে ভাষা ব্যবহারকারীর নানা আরোপিত, সাধারণীকিত ধারণা উক্ত ভাষায় প্রকাশ পায়। সুতরাং সেটি ব্যক্তি মানুষের যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ পায় না। নানা আরোপিত ধারণা মিশ্রিত শব্দাবলী প্রকাশিত হয়। সেখানে নির্দেশক অর্থের তুলনায় জাতিগত অর্থ বেশি প্রভাব ফেলে। এই কারণে বৌদ্ধরা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে যথার্থ অর্থে প্রত্যক্ষ বলেন।

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক উভয় প্রত্যক্ষই স্বীকার করেন। **'তদ্ দ্বিবিধং নিরবিকল্পকং সবিকল্পকং চ ইতি'**[2]। এক্ষেত্রে 'বিকল্প' বলতে বিশেষণ বোধিত হয়েছে। অর্থাৎ কোন বস্তুকে যে বিশিষ্ট করে তাই বিকল্পক। বিশেষণ বর্জিত বস্তুর স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলে। অর্থাৎ যে জ্ঞানে কেবল বিশেষ্য কে বিশেষ্য রূপে এবং বিশেষণ কেবল বিশেষণ রূপে অবগত হয়, কোন সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না, সেই জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলে। যা কেবল প্রত্যক্ষাত্মকই হয়, অনুমান, উপমান বা শব্দাদি জ্ঞানের বিষয় হয় না। কিন্তু নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকারের প্রমাণ রূপে অনুমান প্রমাণকে স্বীকার করতে হয়। অপরদিকে তর্কসংগ্রহকার সবিকল্পক জ্ঞানের লক্ষন করেছেন- **'সপ্রকারকং জ্ঞানং সবিকল্পকম্'। যেমন - ডিৎথঃ অয়ম্, ব্রাহ্মণঃ অয়ম্, শ্যামঃ অয়ম্**

---

[2] শ্রীনারায়ণচন্দ্র, *শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ; সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ; অধ্যাপনাসহিতঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩২২।

প্রভৃতি।[3] কিন্তু নির্বিকল্পক জ্ঞানের কোন উদাহরণ নেই। কেননা, নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রকাশক কোন শব্দ নেই। তবে নির্বিকল্পক জ্ঞানের পরেই সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পূর্বেই বলেছি বিকল্প শব্দের অর্থ হল বিশেষণ। বিশেষণযুক্ত ধারণা প্রকাশক জ্ঞানই হল সবিকল্পক জ্ঞান। যে জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ, এবং তাদের সম্বন্ধের জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে। পূর্বোক্ত উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে আরও বোঝা যায় যে, ডিৎথ হল কোন একটি বস্তুর নাম, ব্রাহ্মণ হল জাতি, এবং শ্যাম হল গুণ বিশেষ। সুতরাং নাম, জাতি, গুন বিশেষণরূপে নিজ নিজ বিশেষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যে জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে। এবং ন্যায় মতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক উভয় জ্ঞানের গুরুত্ব আছে।

আবার অন্যভাবে ন্যায়-বৈশেষিকদের সামান্য সম্পর্কিত মত আলোচিত হতে দেখা যায়, সংযুক্ত সমবায় বা সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষে। আমরা যখন চক্ষু দ্বারা ঘটাদি দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি তখন, চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। এবং ঘটে ঘটত্ব জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এবং চক্ষু দ্বারা ঘটত্ব জাতি প্রত্যক্ষিত হওয়াকে বলে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ। সুতরাং ন্যায় মতে জাতি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। যদিও বৌদ্ধরা তা অস্বীকার করেন কেননা, সামান্য সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় সৎ নয়। সামান্য যেহেতু বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধারণ ধর্ম লক্ষ্য করেই গড়ে ওঠে সেহেতু তা বুদ্ধিমূলক,

[3] তদেব, ৩৩০।

সজ্ঞামুলক নয়। তাদের মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই একমাত্র সৎ, কেননা তা স্বজ্ঞামূলক। এই অর্থে বৌদ্ধ মতে, স্বলক্ষণের জ্ঞানই যথার্থ অর্থে জ্ঞান।

২। সামান্যের অস্বীকৃতি প্রসঙ্গে ন্যায়বিন্দুকারের ব্যাখ্যাঃ– স্বলক্ষনের লক্ষনে ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে ধর্মকৃত্তি বলেছেন, **'তশ্য বিষয়ঃ স্বলক্ষনম্'**[4]। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় স্বলক্ষণ বস্তু। এবং প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয়েছে, **'কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষম্'**[5]। অর্থাৎ কল্পনা রহিত অভ্রান্ত জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধ মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জ্ঞানে কল্পনা এবং ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। নৈয়ায়িকরা নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক বলে প্রত্যক্ষের দুটি বিভাগ করলেও, বৌদ্ধরা নির্বিকল্পক জ্ঞানকে প্রমাণ ও সবিকল্পক জ্ঞানকে প্রমাণের ফল বলে অভিহিত করেন। সেই কারণেই পরমার্থ সৎ বস্তুর জ্ঞান নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্বারা হয় বলে বৌদ্ধরা মত প্রকাশ করেন। কোন বিষয়ের উপস্থিতি মাত্র যে সংবেদন উৎপন্ন হয় তাই হল নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। কিন্তু তারপর ব্যক্তি কল্পনা আকার নাম, রূপ, জাতি, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সংযুক্ত হয়ে সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করে। যেটি বস্তুর স্বরূপ ধর্মের প্রকাশক নয়, সামান্য ধর্মের প্রকাশক। বৌদ্ধ মতে, বস্তুর স্বরূপ ধর্ম হল ক্ষণিকত্ব। এবং যেহেতু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুর এক ক্ষণের জ্ঞান হয়, সেই অর্থে নির্বিকল্পক জ্ঞানই যথার্থ অর্থে জ্ঞান, অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞান। এবং ব্যবহারিক অর্থে সামান্যলক্ষণ

---

[4] সত্যজ্যোতি, *ধর্মকীর্ত্তি রচিত ন্যায়বিন্দু*, সাহিত্যশ্রী, ২১।

[5] তদেব, ১২।

প্রকাশক জ্ঞান হল সবিকল্পক জ্ঞান। অর্থাৎ বৌদ্ধ মতে কেবলমাত্র বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা। উক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয়েছে কল্পনা রহিত জ্ঞান। এপ্রসঙ্গে 'কল্পনা' বলতে বৌদ্ধরা বোঝেন, যে প্রতীতি জ্ঞানকে শব্দ সংযোগের যোগ্য করে তোলে তাই 'কল্পনা' । এবং এই কল্পনা বর্জিত জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ। আবার অন্য ভাবে বলা হয়, **'তিমিরাশু ভ্রমণ নৌযান সংক্ষোভাদ্যনাহিত বিভ্রমং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্'**[6]। অর্থাৎ বর্ণান্ধ, আশু ভ্রমণ, নৌযানে ভ্রমণ বা ব্যাধিগত কারণ প্রভৃতির ভ্রম থেকে মুক্ত বা এই সকল কল্পনা রহিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। এবং উক্ত প্রত্যক্ষকে ন্যায়বিন্দুকার চার প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন, যথা- ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ। এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অব্যবহিত পরবর্তী যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই হল মনোবিজ্ঞান। এবং সকল প্রকার মানসিক অবস্থাই প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রাহ্য হয়। এছাড়া যোগী জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষের অন্তর্গত করা হয়। **'ভূতার্থভাবনা প্রকর্ষ পর্য্যন্তজং যোগিজ্ঞানং চেতি'**[7] । অর্থাৎ সৎ রূপে স্থিত বিষয়ের ভাবনার সর্বোচ্চ প্রকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান হল যোগিজ্ঞান। এবং উক্ত জ্ঞান হল প্রত্যক্ষের অপর এক প্রকার। এবং উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হল স্বলক্ষণ বস্তু। যার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়।

---

[6] সত্যজ্যোতি, *ধর্মকীর্ত্তি রচিত ন্যায়বিন্দু*, সাহিত্যশ্রী, ১৭।

[7] তদেব, ১২।

এছাড়াও বৌদ্ধ দার্শনিকরা সামান্যের সত্তা অস্বীকারের জন্য আরও নানা যুক্তি স্থাপন করেন। যেমন, কমলশিলা (kamalasila) নামে এক বৌদ্ধ দার্শনিক বলেন যে, আমরা বিমূর্ত সামান্যের কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত সত্তা পাই না। আমরা ভাবতেই পারিনা যে, ব্যক্তি অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র সামান্য থাকতে পারে। যেমন, আমরা ব্যক্তি গরুর প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং তার একটা নির্দিষ্ট আকার, আয়তন, রঙ প্রভৃতি সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু গোত্ব নামক সামান্যের এমন কোন সত্তাকে আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমরা যেটা কল্পনা করতে পারি সেটা হল ব্যক্তি গরুর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকার, আকৃতি প্রভৃতি। কাজেই তাত্ত্বিক ভাবে ব্যক্তি স্বতন্ত্র কোন সামান্য স্বীকৃত নয়। '... But to have an abstract idea of a universal apart from the ideas of the particulars is psychological impossibility. The universal cowness (gotva) is supposed to be bereft of the characteristics, colour or shape, which an actual individual cow possesses. But try as we may, we cannot imagine, or have an idea of this universal 'cowness' devoid of those peculiar features of an actual cow. Hence the ontological unreality of the universals.'[8]

[8] Sushanta, *A Study of Universals*, Ressearch Publications Committee, 39.

বৌদ্ধমতে প্রবাহমান স্বলক্ষণই সত্য। বিশেষাতিরিক্ত সামান্য বা জাতি স্বীকৃত নয়। জাতি বা সামান্য বস্তুশূন্য কল্পনা বা সংস্কারমাত্র। আমরা কতকগুলো বস্তুর মধ্যে নানা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার সত্ত্বেও, যৎকিঞ্চিত সাদৃশ্য বশত অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রমাণরহিত বস্তু অতিরিক্ত সামান্য কল্পনা করি, যেটি সংস্কার নির্ভর। এপ্রসঙ্গে বৌদ্ধগণ বলেন যে, কতকগুলো গরুকে দেখে আমরা তা গরু বলি। এবং তা গরু সেটা আমরা অন্যান্য অগরুব্যাবৃত জ্ঞান থেকেই জানি। অর্থাৎ যখন আমরা গরু প্রত্যক্ষ করি তখন এটা গরু ভিন্ন অন্য কিছু নয় এও প্রত্যক্ষ করি, এভাবেই গরুর অনুগত প্রতীতি উৎপন্ন হয়, সামান্য স্বীকারের জন্য নয়। অর্থাৎ বিধিমুখে নয়, নিষেধমুখেই এক জাতীয় বস্তুর জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেন। জাতিসম্বন্ধে বৌদ্ধদের উক্ত মতবাদকে অপোহবাদ বলে। 'অপোহ' অর্থ তৎভিন্নের পরিত্যাগ। অন্যদিকে বৌদ্ধক্ষনভঙ্গবাদানুসারে শব্দ বা বস্তুর নাম কখনই ক্ষণিক স্বলক্ষণকে নির্দেশ করতে পারেনা। যে মুহূর্তে বস্তুর নাম বস্তুকে নির্দেশ করবে, সেই মুহূর্তেই বস্তু ক্ষণিক হওয়ায় অন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হবে। যেমন, ক-ল-ম। এখানে যখন 'ক' উচ্চারণ করছি তখন ল-ম নেই, আবার যখন 'ল' উচ্চারণ করছি তখন 'ক' নেই, 'ম' নেই। আবার 'ম' উচ্চারনের সময় ক-ল নেই, তারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ একমাত্র ক্ষণিক স্বলক্ষণই সৎ। তাই বিধিমুখে বস্তুর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, নিষেধমুখেই সম্ভব । এই যে শব্দের পরোক্ষ অভিধেয়ত্ব তাইই বৌদ্ধ মতে 'অপোহ' বলে। এই মতানুসারে, মানুষ শব্দের অর্থ হবে অ-মানুষ ব্যাবৃত্তি। অর্থাৎ মানুষ হল অ-মানুষ ভিন্ন। অর্থাৎ মানুষ ভিন্ন অন্যকিছু নয়।

এছাড়াও বৌদ্ধগণ বলে যে, গোত্বাদি বিশিষ্ট প্রত্যয়ে যে সম্বন্ধ ভাসমান হয় তা অতদ্ব্যাবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। এবং এবিষয়ে প্রাচীন নৈয়ায়িকদের একদল বলেন যে, গোত্বাভাবাভাব যেমন প্রথম অভাবের অর্থাৎ গোত্বাভাবের প্রতিযোগীতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বরূপ হয়, তেমনি গবেতরভেদও গোভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ঘটক সম্বন্ধস্বরূপই হয়। এবং সে সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। আর নৈয়ায়িকরা সমবায় ইত্যাদির সংসর্গরূপে বিশিষ্ট্যজ্ঞানের বিষয়ত্ব স্বীকার করেন। সুতারাং কোন কোন নৈয়ায়িক অতদ্ব্যাবৃত্তির দ্বারা বিশিষ্টের জ্ঞান হয় তা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন বলে বৌদ্ধরা মনে করেন।

৩। ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত সামান্যতত্ত্ব খন্ডন প্রসঙ্গে বৌদ্ধঃ- বৌদ্ধরা আরও বলেন যে, ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত সামান্য স্বীকার করলে প্রশ্ন হয়, গোত্বরূপ সামান্যের অবস্থান কোথায় ? যদি বলা হয় গোত্বরূপ সামান্য গোতে অবস্থান করে। তাহলে প্রশ্ন হবে 'গো' উৎপত্তির পূর্বে গোত্ব কোথায় অবস্থান করেছিল ? যদি বলা হয় গোভিন্ন অন্য পদার্থে অবস্থান করেছিলো। তাহলে সেটাও সমীচিন নয়। কেননা গো ও গোভেদ উভয়ই একই অধিকরণে থাকতে পারে না। অর্থাৎ গোত্ব ও গোভেদত্ব একই অধিকরণে থাকা সম্ভব নয়। আবার যদি বলা হয় গোশরীর উৎপত্তিদেশে আগে থেকেই গোত্ব ছিল, আর যখন গো উৎপন্ন হল তখন গো কে আশ্রয় করে গোত্ব প্রকাশ পেলো, তাও যথার্থ হয় না। কেননা, সেই দেশে গোত্ব সর্বদা ছিল, না আংশিক ছিল সে প্রশ্ন হবে। আবার যদি বলা হয় গোত্ব কোথাও ছিল না, গো শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে গোত্বের উৎপত্তি হয়। তাও

সমীচীন নয়, কেননা গোত্বরূপ সামান্য ন্যায়-বৈশেষিক মতে নিত্য। আর যা নিত্য তা উৎপত্তি রহিত, এবং যা উৎপত্তি রহিত তা বিনাশ রহিত।

বৌদ্ধরা অপর আপত্তি উত্থাপন করেন যে, ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। কেননা, জাতি যেহেতু নিত্য সেহেতু যখন কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ব্যক্তির জাতিত্ব তৎক্ষনাৎ কি করে উৎপন্ন হবে ? তাহলে তো জাতির তৎক্ষনাৎ উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ জাতি অনিত্য হয়ে যায়। আবার জাতি অন্য ব্যক্তির আশ্রয় থেকে নতুন উৎপন্ন বস্তুতে গিয়ে সম্বন্ধযুক্ত হতেও পারে না। কেননা, জাতি নিষ্ক্রিয়। আবার জাতি যেহেতু দ্রব্য নয়, সেহেতু চলনগমনাদি অস্বীকৃত।

আবার প্রশ্ন হল, জাতি কি সর্বত্র বিরাজমান ? তা হতে পারেনা। তাহলে গোতে অশ্বত্বের সামান্যত্ব উপলব্ধ হবে। আবার জাতি কি স্বশ্রেণীর সর্ব ব্যক্তিতে বিরাজমান ? তাও যথার্থ নয়। পূর্ব থেকে অবস্থানরত ব্যক্তিতে জাতি থাকলেও উৎপদ্যমান বস্তুতে জাতির অবস্থান কি করে সম্ভব তার ব্যাখ্যা যথার্থভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে সমস্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হলেও জাতি অবিনশ্বর, একথা স্ববিরোধী উক্তি। কেননা তাঁদের মতে ব্যক্তি জাতির আশ্রয়। আশ্রয় বা অবলম্বন বিনষ্ট হলে জাতি অবস্থান করে কি করে? আর কোথায়বা অবস্থান করে ?

বৌদ্ধমত খণ্ডন করে ন্যায়- বৈশেষিক সম্প্রদায় সামান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বলেন যে , বৌদ্ধ অপোহবাদ যথার্থ নয়। তাঁদের মতে, সামান্য নিত্য এবং ব্যাপক এবং তা সামান্যের

আগন্তুক ধর্ম নয়, স্বরূপধর্ম। এবং স্বরূপসম্বন্ধেই সামান্য সর্বদেশে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এই কারণে জাতি ব্যক্তি নয়। যেহেতু জাতি নিত্য ও সর্বব্যাপক ফলে জাতির কোন অংশ স্বীকৃত নয়। তাছাড়া জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ প্রসঙ্গে বলা যায়, জাতি সর্বত্র স্বরূপসম্বন্ধে অবস্থান করলেও স্বশ্রেণীতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। ফলে গোত্বতে অশ্বত্বের জ্ঞান হয়না। সকল গোতে গোত্ব সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে, এবং অ-গোতে গোত্ব স্বরূপসম্বন্ধে অবস্থান করায় গোতে অশ্বত্বের ভ্রম উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ জাতি সর্বত্র বিরাজমান হলেও তার অধিকরণ বা আশ্রয় ব্যক্তি।

আবার জাতির নিরাশ্রয়তা প্রসঙ্গে বলা যায়, যদিও জাতি স্বশ্রেণীগত বস্তু ছাড়া অভিব্যক্ত হয়না, তবুও অপ্রকট অবস্থায় বা নৈব্যক্তিক অবস্থায় জাতি কালে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য বৌদ্ধমতে কালপদার্থই অসিদ্ধ। এপ্রসঙ্গে বৌদ্ধরা বলেন যে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধ অতিরিক্ত কাল বলে কিছু নেই। সবিষয়ের ইন্দ্রিয়গুলি হল রূপস্কন্ধ, আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান প্রবাহ হল বিজ্ঞানস্কন্ধ, সুখ- দুঃখাদি প্রত্যয়ের প্রবাহকে বলে বেদনাস্কন্ধ, গোঃ-এরূপে শব্দোল্লেখিত সংস্কার প্রবাহ হল সংস্কারস্কন্ধ।[৭] কাল সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দ্বিবিধ, তার মধ্যে আলয় বিজ্ঞানাদি ক্ষণরূপে তথা বিষয়াদি বা সেই সেই ক্ষণমিলে স্থূলকালরূপে পরিচিতি লাভ করে। অতএব, কাল পদার্থ পঞ্চস্কন্ধ ব্যতিরেক কিছু নয়। এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন যে, **“ ইহ কপালে ঘটো**

---

[৭] সেখ সাবির, *শঙ্করমিশ্রকৃতঃ বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ*, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৪৮।

ভবিষ্যতি, কপালমিব যুগপজ্জাত," ইতি যে প্রত্যয় হয়, তাতে তৎ তৎ উৎপত্তির অধিকরণরূপে কাল বিষয়রূপে ভাসিত হয়। এইভাবে তৎতৎ কার্যের প্রতি তৎতৎ কাল বিশেষের কারণত্ব সিদ্ধ হওয়ায় **'যদ্বিশেষয়োঃ'**- এই ব্যাপ্তি বলে কার্য মাত্রের প্রতি কালের কারণত্ব সিদ্ধ হয়। এমনকি **'কালঃ স্বভাবো নিয়তিঃ'**- ইত্যাদি শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেও কালপদার্থকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করা হয়েছে। অতএব, কালপদার্থ অতিরিক্ত রূপে স্বীকৃত।[10]

সর্বোপরি, বৌদ্ধরা যেভাবে অনুগত প্রতীতির নিষেধমুখে ব্যাখ্যা করেন তা যথার্থ নয়। বরং বিধিমুখেই আনুগত প্রতীতি জন্মায়। একাকার প্রতীতি যদি অতদব্যাবৃত্তি বা ভেদকে নিজ বিষয় করে, তাহলে সেটি নঞর্থকভাবে সাদৃশ্যের জ্ঞান উৎপন্ন করবে। কিন্তু আমরা এটা গরু নয়, ওটা গরু নয় এভাবে এই জ্ঞানে উপনীত হতে পারিনা যে, এটা গরু। বরং এটা গরু, ওটা গরু, এরূপ প্রতিটি গরুর মধ্যে কম বেশি সাদৃশ্য দেখে, গরুর জ্ঞান লাভ করি। তাছাড়া এটা গরু নয়, ওটা গরু নয় এভাবে সকল অ-গরুকে প্রত্যক্ষ করাও অসম্ভবপ্রায়। তার দ্বারা কখনই আমাদের গরুর জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কাজেই নিষেধমুখে সামান্যের জ্ঞান হয় না বরং বিধি মুখে সামান্যের জ্ঞান হয়। অতএব সামান্য পদার্থ অবশ্যই স্বীকৃত।

---

[10] তদেব, ২৪৯।

৪। সামান্য প্রসঙ্গে জৈন মতঃ– জৈন মতে, সামান্যের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ (Relation of identity)। তাঁদের মতে, সামান্য ব্যক্তি স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বাস্তব পদার্থ নয়, সামান্য ব্যক্তি নির্ভর। একজাতীয় অনেকগুলো ব্যক্তির বা বস্তুর মধ্যে সাধারণধর্ম প্রত্যক্ষ করে আমরা তাদেরকে একটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি। কেননা, একজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তিগুলি থেকে ভিন্ন জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তিকে পৃথক করা সম্ভব হয়। এবং এভাবে একটা সামান্য ধারণা গঠিত হয়। তবে তা ব্যক্তি অতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। যেমন, বিভিন্ন গো ব্যক্তির মধ্যে নানা বৈসাদৃশ্য থাকার সত্ত্বেও একটা সাধারণ ধর্ম বা একই রকম ধর্ম পরিলক্ষিত হয়, যেটি আমরা গোত্ব নামে অভিহিত করি। কারণ, তার দ্বারা সকল গরুকে বোঝানো হয় এবং গোভিন্ন অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেও ব্যাখ্যা করা যায়। তবে গোত্বরূপ সাধারণ ধর্মটির ব্যক্তিগোভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। গোত্ব গো ব্যক্তি নির্ভর রূপেই অস্তিত্বশীল থাকে। অর্থাৎ সামান্য বা সাধারণ ধারণা আমাদের মানসিক প্রত্যয় ছাড়া কিছু নয়। এই মতবাদ কে অনেকে সামান্য সম্পর্কিত প্রত্যয়বাদও (Conceptualism) বলেন।

৫। জৈনদের সামান্য সম্পর্কিত মত খন্ডনে ন্যায়-বৈশেষিকঃ– ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জ্ঞানমাত্রই বিষয় নির্ভর। সুতরাং সামান্য জ্ঞান অবশ্য সামান্য বিষয় নির্ভর হবে। তাছাড়া অনেক গো ব্যক্তিতে যে অনুগতাকার জ্ঞান হয় এবং তার বিষয় যদি ব্যক্তি গো হয়, তাহলে কখনই সামান্য ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, ব্যক্তি গো এর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্য বরং বেশি। সুতরাং ব্যক্তির উক্ত বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করলে কখনই

সামান্যের ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ব্যক্তি অতিরিক্ত সামান্য সত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, সামান্য নিত্য এবং অনেক সমবেত। ব্যক্তির বিনাশে সামান্য কালে অবস্থান করে। যখন ব্যক্তি পুনরায় উৎপন্ন হয়, তখন জাতি উক্ত ব্যক্তিতে সমবেত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্লেটোর মতে ধারণাতত্ত্ব

১। সামান্যের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দর্শনঃ– প্রাচীন গ্রীক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হল জগৎ এর উৎপত্তি ও বিস্তৃতির প্রসঙ্গ নিয়ে। "Greek philosophy begins in the sixth century before Christ. It begins when men for the first time attempted to give a scientific reply to the question, what is the explanation of the world?" ।[1] জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রীক দার্শনিক বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন - দর্শনের জনক 'Thales' এর মতে, জলই হল জগৎ উৎপত্তির মুখ্য উপাদান। আবার 'Anaximander' জগৎ উৎপত্তির জন্য এমন কোন নির্দিষ্ট উপাদান মানতে নারাজ। অন্যদিকে 'Anaximenes' এর মতে, জগৎ উৎপত্তির প্রাথমিক উপাদান হল বায়ু। সংখ্যাকেও কেউ কেউ জগৎ উৎপত্তির কারণ বলে মনে করেন। কিন্তু এই ধরণের ব্যাখ্যাতে যথার্থ দার্শনিক সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কেননা দার্শনিক প্রশ্ন শুধুই জগত কেন্দ্রিক নয়, জগত অতিবর্তীও বটে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এই কারণে যে, মানুষের জীববৃত্তিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিত্ব দুইই আছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর

[1] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan Publishers India Limited, 18.

জীবত্ব ধর্ম থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিত্ব ধর্মটা নেই। এবং উক্ত ধর্মের জন্য মানুষ স্বভাবতই জানতে ভালবাসে। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে মানুষ জানতে চায়। এই জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা তো জানা গেল কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ ? সেটা যথার্থ না অযথার্থ ? এই জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা কি এই জাগতিক উপাদান দিয়ে দেওয়া সম্ভব না অন্য কোন অতিজাগতিক সত্তাকে স্বীকার করা প্রয়োজন ? আবার যার মাধ্যমে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাতে কোন সীমাবদ্ধতা আছে কী যার জন্য আমাদের নানা ভ্রম সৃষ্টি হয় ? কেননা, আমরা সর্বদা যথার্থ প্রত্যক্ষ করি না। রজ্জুতে সর্পভ্রম আমাদের হয়। আবার অন্য দিকে জগতের সব কিছুই যে ভ্রান্তভাবে দেখি তাও নয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, যথার্থ জ্ঞান আমরা লাভ করি কিভাবে ? কোন উপায়ে ? এমন নানা সমস্যা নিয়ে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বিভিন্ন দার্শনিকরা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করেছেন।

২। ধারণাতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্লেটোঃ– এখানে আমরা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর অধিতত্ত্বের ধারণা সম্পর্কিত মতবাদ (Theory of Ideas) আলোচনা করবো। এক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা থেকে অধিবিদ্যক আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। জ্ঞানতত্ত্বের শুরুতেই তিনি জ্ঞান কি নয় তার আলোচনা করেছেন। ‘Theaetetus’ গ্রন্থে জ্ঞান কি নয় অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বের নেতিবাচক দিক আলোচিত হয়েছে। এখানে প্লেটো বলেন যে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, জ্ঞান কোন তথ্য নয় বা তথ্য সমন্বিত বিচারও নয়। অন্য দিকে ‘Republic’ গ্রন্থে জ্ঞান কি (What is Knowledge?) তা আলোচিত হয়েছে। যদিও

বিভক্ত রেখার (Divided Line) উপমা টেনে জ্ঞানের নেতিবাচক দিকও আলোচিত হয়েছে। তবুও 'Theaetetus' গ্রন্থকে প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বের নেতিবাচক দিক আলোচিত গ্রন্থ হিসাবে এবং 'Republic' গ্রন্থকে প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার ইতিবাচক দিক সম্বলিত গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্লেটো বলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু জাগতিক বিষয় তা সবই পরিবর্তনীয়, এদের সম্পর্কে শুধুই মতামত প্রদান করা যায় মাত্র, কোন জ্ঞান হয় না। মতামত কাল ও ব্যক্তি (Time and Person) সাপেক্ষ। আজ যে গাছের পাতা সবুজ, কাল তা হয়তোবা অন্য কোন রঙের হয়ে যাবে। একই আবহাওয়াতে কারোর গরম লাগে, কারোর বা ঠাণ্ডা লাগে। অন্যদিকে যা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় তা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না। যথার্থ জ্ঞানের বিষয় সামান্য, অপরিবর্তনীয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। যাকে প্লেটো সামান্য (Universal), সারসত্ত্বা (Essences), আকার (Forms) বলেছেন। এগুলি সবই নিত্য ও পরাজাগতিক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এদের ছায়াপাত ঘটে। উক্ত ছায়াময় জগত দেখে আমাদের তার উৎস জানতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সহযোগিতা করে না। কারণ তা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার অতীত। একমাত্র বুদ্ধিমূলক সজ্ঞা (Intellectual Intuition) উক্ত উৎস সম্পর্কে জানতে সহযোগিতা করতে পারে মাত্র। যেমন - সৌন্দর্যের সঙ্গে সুন্দর বস্তুর পার্থক্য হল উৎসের সঙ্গে ছায়ার পার্থক্য। সৌন্দর্য হল মূল এবং এ বিষয়ে আমাদের বুদ্ধিমূলক সজ্ঞার দ্বারাই জ্ঞান হয়। কিন্তু সুন্দর সুন্দর বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়

অভিজ্ঞতালব্ধ। তাই একজনের কাছে যা সুন্দর অন্য জনের কাছে সেটি হয়তোবা কুৎসিত মনে হতে পারে।

প্লেটো তাঁর ‘Republic’ গ্রন্থে জ্ঞানতত্ত্বকে বা জ্ঞানতত্ত্বের ইতিবাচক দিককে এক বিভক্ত রেখার (Divided Line) উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। এবং গুহার রূপক (Allegory of the cave) ব্যবহার করে তাকেই আবার ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিভক্ত রেখা হল একপ্রকার আনুরূপ্যতা (Correspondence), যার দ্বারা অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যক্ত হয়। প্লেটোর বিভক্ত রেখার উপমাটি এমনই যে, (Republic 509d6-511e5)[2]

<table>
<tr><th colspan="4">মঙ্গল(Good)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">জ্ঞানের স্তর</td><td>D. Abstract Knowledge.বিমূর্ত জ্ঞান</td><td>Intelligence. বিশুদ্ধ সারসত্তা সমূহ</td><td rowspan="2">জ্ঞানের বিষয়</td></tr>
<tr><td>C. Mathematical Knowledge. গাণিতিক জ্ঞান(মূর্ত)</td><td>Thinking(চিন্তামূলক)
গণিত প্রভৃতি বিষয়</td></tr>
<tr><td rowspan="2">বিশ্বাস বা মতামতের স্তর</td><td>B. Visible Thinking. ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত</td><td>Belief(বিশ্বাস)। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয়</td><td rowspan="2">বিশ্বাস বা মতামতের বিষয়</td></tr>
<tr><td>A. Images (কল্পনা)</td><td>Imagining(কল্পনার বিষয়)। যেমন মানুষের ছবি, স্বপ্নের বিষয় প্রভৃতি</td></tr>
</table>

[2] Francis Macdonald, *The Republic of Plato*, Oxford, 216.

উপরের রেখাচিত্রে বাম দিকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের অবস্থান এবং ডানদিকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে। রেখাচিত্রের উপরের অংশে জ্ঞান ও নীচের অংশে বিশ্বাস বা মতামতের কথা বলা হয়েছে। রেখাচিত্রটি মোট চারটি অংশে বিভক্ত। অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে মনের যে অগ্রগতি বা উদ্ধগতি তা শুরু হল A এবং শেষ হল D । A থেকে B এর পার্থক্য পরিমাণগত বা মাত্রাগত (Differences in Degree) এবং একইভাবে C থেকে D এর পার্থক্য হল মাত্রাগত (Differences in Degree) । কিন্তু রেখার নিম্ন দিকে অবিমূর্ত A ও B এর সাথে রেখার উপর দিকে অবস্থিত C ও D এর পার্থক্য গুনগত (Difference in Quality)। রেখাচিত্রে যে বিষয়গুলি অনুচ্চারিত থেকে গেল বলে মনে হয় তা হল, মনের ক্ষমতা বা বৃত্তি। প্লেটোর মতে, জ্ঞান সম্ভব হয় মনের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বা বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা বা সামর্থের (Power of Reason) দ্বারা এবং মতামত গড়ে ওঠে ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্ষমতা বা সামর্থের দ্বারা (Power of Sensation) । প্লেটোর মতে, বুদ্ধিবৃত্তির কাজ যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তি সম্পন্ন করতে পারে না, তেমনি ইন্দ্রিয়বৃত্তির কাজও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন করতে পারে না।

উপরোক্ত রেখাচিত্রের চারটি অংশ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হয়। **A** হল জাগতিক বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় স্তর অথবা বলা যায় অজ্ঞান থেকে মানুষের জ্ঞানের দিকে উত্তরণের সর্বনিম্ন ধাপ। এখানে আমাদের যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে মতামতের নিম্নরূপ বলে। একে আমরা কল্পনা বা স্বপ্ন বলতে

পারি। এবং এর বিষয় হল দ্বিতীয় প্রকৃতি, যা প্রথম প্রকৃতির মনুষ্য রচিত নকল। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে প্রথম প্রকৃতি কি ? প্রথম প্রকৃতি হল, আদি সত্যের বা মূল সত্যের নকল বা ছায়া। এবং দ্বিতীয় প্রকৃতি হল, ছায়ার ছায়া বা নকলের নকল। এরূপ অবস্থা লাভ করা যায় কল্পনা বৃত্তির দ্বারা। যা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়বৃত্তিরই প্রকার। যেমন - আমরা যে বিছানায় শয়ন করি তা হল প্রথম প্রকৃতি, কিন্তু চিত্রকার উক্ত বিছানার যে ছবি আঁকবেন তা হল দ্বিতীয় প্রকৃতির অন্তর্গত। প্লেটোর মতে, উক্ত দ্বিতীয় প্রকৃতির কোন সত্যমূল্য নেই। তবে মানব জীবনে এর কার্যকারিতা আছে। B হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার প্রথম স্তর এবং এর বিষয় হল প্রথম প্রকৃতি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রথম প্রকৃতি হল আদি সত্যের ছায়া স্বরূপ। যেমন - সৌন্দর্য হল আদি সত্য এবং জগতের বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর বস্তু হল উক্ত সৌন্দর্যের ছায়া স্বরূপ, যাদের আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় পাই। যদিও এদের সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান হয় না, তবুও আমরা উক্ত বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু উক্ত মতামতের সার্বজনীনতা থাকে না। কেননা, তার প্রমাণ আমরা এভাবেই পাই যে, এক জনের কাছে যা সুন্দর অন্য জনের কাছে তা সুন্দর নাও লাগতে পারে। প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বস্তুর সত্যমূল্য না থাকলেও তার ব্যবহারিক মূল্য তিনি অস্বীকার করেননি। যদিও প্লেটো এক্ষেত্রে সত্য বলতে আদি সত্যের ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, সাধারণত আমরা তাদেরই সত্যমূল্য আছে বলে দাবি করি যা অপ্রাসঙ্গিক নয়, স্ববিরোধী নয়। অর্থাৎ যার বাস্তব মূল্য আছে বা ব্যবহারিক মূল্য আছে। যেমন - আমরা যখন বলি দেওয়ালটি হয় সাদা। তখন উক্ত বাক্যটি স্ববিরোধী নয়। এবং

উক্ত বাক্যটি তখনই সত্য হবে যখন বাস্তবিক দেওয়ালটি সাদা হবে। এবং তখনই মিথ্যা হবে যখন দেওয়ালটি সাদা না হবে। ফলে উক্ত বাক্যের বাস্তব মুল্য আছে তা স্বীকার করে নেওয়া হল এবং তার ব্যবহারিক মূল্যকেও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আমরা দেখলাম যার ব্যবহারিক মূল্য আছে তার সত্যমূল্যও থাকে। কিন্তু প্লেটো বলছেন যে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বস্তুর সত্যমূল্য না থাকলেও তার ব্যবহারিক মূল্য আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্লেটো সত্যমূল্য বলতে আদি সত্যের কথাই বলেছেন। C হল জ্ঞানের নিম্ন অবস্থা। এর বিষয় হল একপ্রকার মধ্যবর্তী সত্তা যার অস্পষ্ট প্রতিরূপ তৈরি করা যায়। যেমন - ত্রিভুজ হল বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়, যদিও তা জমির উপর দাগ কেটেই তবে এর প্রতিরূপ পেতে হয়। তেমনি D, C প্রভৃতি অক্ষরগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু নয়, তা বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়। কিন্তু এগুলোকে আমরা প্রকাশ করি এভাবে যে, একটি পাথর, একটি মোবাইল ফোন প্রভৃতি। প্লেটোর মতে, এসকল বিষয়ের জ্ঞান সুনিশ্চিত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। **A** হল জ্ঞানের উচ্চ অবস্থা। এই জ্ঞানের বিষয় সারসত্ত্বা (Essence) যা পরাজাগতিক, যার দৃষ্টান্ত হয় না এবং যা কেবলমাত্র বুদ্ধি প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য। সৌন্দর্য, ন্যায়, শৌর্য প্রভৃতি বিষয়গুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এবং এগুলির সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান হয়। যদিও সারসত্তাসমূহ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ও অস্তিত্বশীল, তথাপি এদের সকলের মধ্যে বিন্যাসের সম্পর্ক আছে। এবং উক্ত বিন্যাস অনুযায়ী কেউ অধিনস্ত কেউবা উর্দ্ধতন। সকল সারসত্তার চূড়ান্ত সারসত্তা বা সকল সারসত্তাই যার অধিনস্ত তা হল, 'The Good' বা মঙ্গল। এবং উক্ত মঙ্গলকে বুদ্ধিদ্বারা প্রত্যক্ষ করাই হল প্রকৃত দার্শনিক প্রজ্ঞা।

প্লেটোর ‘Republic’ গ্রন্থে জ্ঞানতত্ত্ব থেকে অধিতত্ত্বে উত্তরণের নিদর্শন আরও স্পষ্ট হয় গুহার রূপক (Allegory of the Cave) আলোচনার মাধ্যমে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, কেমন করে মানুষের মন অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে উত্তোলিত হয়ে পরম জ্ঞানের শিখরে অর্থাৎ মঙ্গলের জ্ঞানে (Knowledge of Good) উপনীত হতে পারে। তিনি বিভক্ত রেখার উপমার সাহায্যে যেভাবে জ্ঞানতত্ত্ব থেকে অধিতত্ত্বে উত্তরণের আলোচনা করেছেন, গুহার রূপক তারই এক ভিন্নভাবে উপস্থাপন। যদিও দুটি বিষয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তবে গুহার রূপককে বুঝতে গেলে, প্লেটোর দ্বিজাগতিক ধারণার ব্যাখ্যা ভালো করে বোঝা দরকার। প্লেটোর মতে, আমাদের দৃশ্যমান জগত সদা পরিবর্তনশীল, সদা চঞ্চল। কিন্তু চঞ্চলতার সত্ত্বেও একটি গাছের সাথে অন্য একটি গাছের, একটি মোবাইলের সাথে অন্য একটি মোবাইলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে পারি এবং তাদের এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কারণ প্লেটোর মতে, একই শ্রেণীর বিভিন্ন জাগতিক বস্তু একই পরাজাগতিক নিত্য বস্তুর বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতির যে আধারে এই ছবিগুলি রচিত হয় সে আধারের গুনে ছবিগুলি অবিকল নয় বা মূলের সব গুণও তাতে বিম্বিত হয় না। এবং প্রকৃতির আধারের গুণে তারা গতিপ্রাপ্ত হয়। এই ছায়াগুলি সবই মূলের অস্পষ্ট নকল। প্লেটোর মতে, আসলকে ছেড়ে নকল গুলিকে জানলে, তা থেকে আমাদের কোন জ্ঞান হয় না। বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে গেলে আসলকে জানা দরকার। যাকে প্লেটো আকার (Form) বা সারসত্তা (Essence) বা ধারণা (Idea) বা সামান্য (Universal) বলেছেন।

প্লেটোর মতে, কোন এক ঈশ্বর (Demi Urge) এদের ছায়াপাত ঘটিয়ে আকার বিহীন জড়বস্তুর আধারে প্রকৃতি রচনা করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির বস্তুসমূহ হল নিত্য বস্তুসমূহের নকল। যেমন - একই চাঁদ বিভিন্ন জলাশয়ে বিম্বিত হয়ে বিভিন্ন চাঁদ দেখায়। কিন্তু তার কোনটিই চাঁদ নয়। জাগতিক বস্তুগুলিও ঠিক তাই। চাঁদকে জানতে হলে প্রকৃত চাঁদ কে জানা দরকার, ছায়াকে নয়। প্রকৃতপক্ষে চাঁদের ছায়া গুলি সম্পর্কেও যথার্থভাবে জানতে গেলে প্রকৃত চাঁদকে জানা দরকার। প্লেটো প্রকৃতের জ্ঞান বলতে আকার (Form) বা সারসত্তা (Essence) বা ধারণা (Idea) বা সামান্যকে (Universal) বুঝিয়েছেন। উক্ত সত্তার মধ্যে মূল সত্তা হিসাবে তিনি 'Good' বা মঙ্গলকে বুঝিয়েছেন। যাকে আবার তিনি সূর্যের (The Sun) সাথে তুলনা করেছেন। এই পৃথিবীর সবকিছুই সূর্য থেকে এসেছে, এবং সূর্যের আলোতে আমরা যেমন সবকিছু দেখি তেমনই 'Good' হল সকল জাতির রক্ষার শর্ত, জ্ঞানের শর্ত এবং আমাদের কাছে নৈতিকতার শর্ত। অজ্ঞতার অন্ধকার পেরিয়ে মঙ্গল বা 'Good' কে জানাই জানার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই সমস্ত ব্যাপারটি প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে গুহার রূপক (Allegory of the Cave) ব্যবহার করে বলেছেন[3]।

প্লেটো বলেছেন যে, কল্পনা করা যাক আমাদের ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে একটি গুহা আছে যার মুখ আলোর দিকে উন্মুক্ত। এই গুহার মধ্যে কিছু মানুষ বাস করে যাদের হাত, পা, ঘাড় এমন ভাবে বাঁধা যে তারা গুহার পিছনের দেওয়ালটিকেই শুধু দেখতে পায়, বাধার

[3] Francis Macdonald, *The Republic of Plato*, Oxford, 222.

কারণে গুহার যে মুখটি আলোর দিখে আছে তা তারা দেখতে পায় না। ফলত তারা সূর্যের আলো কোন দিন দেখেনি। আবার এও কল্পনা করা যাক যে, গুহার প্রবেশের পথের কিছুটা দূরে আগুন জ্বলছে এবং আগুনের কিছু দূরে সামনে একটি পর্দা ও অর্ধেক উচু করা দেওয়াল আছে। এই পথ দিয়ে বাইরের জগতের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে যায় এবং তার ছায়া গিয়ে পড়ে পিছনের দেওয়ালে, যে দিকে গুহার বন্দিরা মুখ করে বাঁধা অবস্থায় আছে। বন্দিরা জীবনের শুরু থেকে এই আলো আধারিতে অভ্যস্ত এবং তাদের সামনে যে ছায়া গুলি ভেসে আসে সেগুলিকেই তারা চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করে। এর পর যদি কোন এক বন্দিকে বন্ধন মুক্ত করে গুহার বাইরে নিয়ে আশা হয়, তাহলে সে প্রথম অবস্থায় সূর্যের আলোর দিকে তাহাতেই পারবে না। ধীরে ধীরে তার চোখ সূর্যের আলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং ছায়া ছেড়ে আসল বস্তুগুলিকে দেখবে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় বিশ্বাস করতে পারবেনা যে এখন যে গুলি দেখছি তাই সত্য, আগেরগুলি নয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সে বুঝতে পারবে কোনটা আসল আর কোনটা ছায়ার জগত।

এক্ষেত্রে গুহার রূপকে আলো আধারিতে ছায়া প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং সূর্যের আলোতে বস্তুর দিকে চোখ মেলে বস্তু দেখা হল বুদ্ধি প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ থেকে সরে এসে বুদ্ধি প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করা হল, জ্ঞানগত দিক থেকে বন্দিজীবন থেকে মুক্তি লাভ করা। যে ব্যক্তি এখন ছায়া ছেড়ে মূল বস্তুকে দেখছে, সে একদিন এও জানবে যে সকল মূল বস্তুই এসেছে সূর্য থেকে। সূর্যের তুলনা মঙ্গলের (Good) সাথে। অর্থাৎ মঙ্গলকে

জানাই হল চূড়ান্ত জানা, চূড়ান্ত প্রজ্ঞা। দার্শনিক অভিভাবকেরা হবেন সেই চূড়ান্ত জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অধিকারী। অর্থাৎ সদর্থক অর্থে জ্ঞান কি সে বিষয়টি তাঁর 'Republic' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে ধারণার জ্ঞানই (knowledge of Ideas) যথার্থ অর্থে জ্ঞান। এবং এই বস্তু জগত হল ধারণার জগতের আনুলিপি (copy) । অর্থাৎ প্লেটোর মতে, আমাদের বস্তুজগতের যাবতীয় জ্ঞান হল প্রতিলিপির জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান নয়। এবং ধারণার অবস্থান অতিবর্তী জগতে। প্লেটোর মতে, বস্তু জগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় না, আমাদের মতামত বা 'opinion' হতে পারে। কিন্তু ধারণার জগত সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞান হয়ে থাকে। যেহেতু বস্তু জগতের জ্ঞান অভিজ্ঞতা লব্ধ তাই ভ্রান্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান যেহেতু বুদ্ধি গ্রাহ্য তাই উক্ত বিষয়ে জ্ঞান সর্বদা অভ্রান্ত হয়। বস্তু জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান ব্যক্তি মন সাপেক্ষ হলেও ধারণার জ্ঞান ব্যক্তি মন নিরপেক্ষ। যেমন - বিশেষ বিশেষ ফুল সুন্দর হলেও তার তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু উক্ত বিশেষ বিশেষ ফুলের সৌন্দর্যের উৎসরূপে যে সৌন্দর্যের ধারণা তা অপরিবর্তনীয়। বিশেষ বিশেষ ফুলের সুন্দরতা নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। অর্থাৎ একজনের কাছে যা সুন্দর তা অন্য জনের কাছে নাও সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ধারণা রূপে যে সৌন্দর্য তার সম্পর্কে বিপরীত মত হতে পারে না। কেননা, তা অপরিবর্তনীয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। এবং বিশেষ বিশেষ বিশেষ ফুলের সৌন্দর্য ব্যক্তি মন নির্ভর হওয়ায়, এক জনের কাছে যা সুন্দর, অন্য জনের কাছে তা সুন্দর মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ধারণা রূপে সৌন্দর্য ব্যক্তিমন গ্রাহ্য নয় বরং তা বস্তুগত ধর্ম, এবং তা আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য। সুতরাং তা স্বভাবতই সুন্দর। প্লেটো এভাবে

প্রতিটি একই রকম সদৃশ বস্তুর জন্য একটি করে ধারণা স্বীকার করেছেন। ফলত বিভিন্ন সদৃশ বস্তুর জন্য বিভিন্ন ধারণা স্বীকার করায় ধারণাকে বহু বলতে হয়। কিন্তু প্লেটো সকল ধারণার মূল বা ঐক্য বিধায়ক ধারণা রূপে 'Good' এর ধারণা স্বীকার করেছেন, যাকে তিনি 'God' এর সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ধারণা হল, 'Idea of Good or Idea of God'.

প্লেটো এর উক্ত ধারণা তত্ত্ব অংশত যৌক্তিক ও অংশত অধিবিদ্যক। 'This theory is partly logical, partly metaphysical'[4] । ধারণা তত্ত্বের যৌক্তিক ব্যাখায় বলা হয় যে, ধারণা হল সামান্যের ধারণা বা সাধারণ ধারণা। যেমন – ব্যক্তি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন হলেও , কেউ বা লম্বা, কেউ বা বেঁটে, প্রভৃতি নানা পার্থক্য থাকলেও প্রতিটা মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ মিল বা সাদৃশ্য থাকার জন্য আমারা সকলকে মানুষ বলে অভিহিত করি। এবং এটাই হল সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Common Character) । যেমন - মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম হল মনুষ্যত্ব, গরুর সাধারণ ধর্ম হল গোত্ব। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, বিভিন্ন বস্তু যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়, ধারণারও কি এমন অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য রূপ আছে, যার সাহায্যে তা প্রত্যক্ষ করা যায় ? কেননা অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, আমাদের সকল জ্ঞানের উৎস অভিজ্ঞতা। তাহলে ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞানেরও উৎস কি অভিজ্ঞতা ? এক্ষেত্রে প্লেটোর মতে ধারণা সম্পর্কিত জ্ঞান

[4] Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, 123.

সম্পূর্ণ বুদ্ধিলব্ধ এবং অভিজ্ঞতায় যে সকল জ্ঞানকে অভ্রান্ত বলে মনে হয় তা আসলে উক্ত ধারণার প্রতিচ্ছবি মাত্র। ধারণাই হল প্রকৃতপক্ষে সকল জাগতিক জ্ঞানের উৎস। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমরা যদি বলি সুন্দর কি ? তার উত্তর আমাদের মনে হতে পারে অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সুন্দর বিষয়। কিন্তু এগুলো সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তির উদাহরণ। যেমন - আমরা বলে থাকি চাঁদ খুব সুন্দর, শিশুর মুখ খুব সুন্দর এবং তুলনা করেও বলি শিশুর মুখ চাঁদের মতো সুন্দর, গোলাপ ফুল সুন্দর প্রভৃতি। কিন্তু সুন্দর কি ? তার কোন উত্তর অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। প্লেটোর মতে, উক্ত সুন্দরের ধারণা আমাদের মনে থাকে। যার সঙ্গে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাই অভিজ্ঞতার জগতের। তাহলে প্রশ্ন জাগে ধারণা কি মন স্বাপেক্ষ ? না মন নিরেপেক্ষ ? কিন্তু প্লেটোর মতে, ধারণা ব্যক্তি মন নিরপেক্ষ। অপরদিকে ধারণা তত্ত্বের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় বলা হয় ধারণা এক, অপরিবর্তনীয়, নিত্য, এবং ঈশ্বর সৃষ্ট।

৩। প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যঃ- প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে যে সকল বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয় তা হল, **প্রথমত** - ধারণা হল দ্রব্য। সাধারণত দ্রব্য বলতে বোঝায় বিভিন্ন পদার্থ। যেমন - কাঠ, মাটি, পাথর প্রভৃতি এবং দ্রব্য হল গুণের আঁধার। অর্থাৎ দ্রব্য ছাড়া গুন থাকতে পারে না। কিন্তু গুন ছাড়াও দ্রব্য থাকতে পারে। যদিও 'Idealist'-দের মতে মন নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং জড়পদার্থ মন নির্ভর, তাই মন দ্রব্য হলেও জড়পদার্থ নয়। (... If, with the idealists, we think that mind is a self- existent

reality, and that matter owes its existence to mind, then in that case matter is not substance, but mind is...) ।[5] ঠিক একই ভাবে ধারণা হল দ্রব্য, যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল, যার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু জাগতিক সকল কিছুই ধারণা নির্ভর।

দ্বিতীয়ত - ধারণা হল সামান্য (Universal) । অর্থাৎ ধারণা হল সমগ্র এবং তার অংশ রূপে এই প্রতিচ্ছবির জগত, যা সামান্যে অংশগ্রহণ করে মাত্র। যেমন - মনুষ্যত্ব হল সামান্য এবং ব্যক্তি মানুষ তার প্রতিচ্ছবি মাত্র।

তৃতীয়ত - ধারণার কোন দৈশিক রূপ নেই, ধারণা হল দ্রব্য বাচক চিন্তা। তাহলে এখানে প্রশ্ন জাগে, অদৈশিক চিন্তা হলে তা কি ব্যক্তি মনের চিন্তার বিষয়, না ঈশ্বরের চিন্তার বিষয় ? না কোনটিই নয় ? কিন্তু প্লেটোর মতে, উক্ত দুটির কোনটিই নয়। "The first is to suppose that they are the thoughts of a person, that they are your thoughts or my thoughts. The second is to suppose that they are thoughts in the mind of god. Both these views are wrong"।[6] প্লেটোর মতে, ধারণা কোন ব্যক্তিমন সাপেক্ষ বিষয় নয়, ব্যক্তিমন বা ঈশ্বরের মন নিরেপেক্ষ রূপে

---

[5] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan Publishers, 187.
[6] Ibid, 188.

ধারণার অবস্থান। "They are objective ideas, thoughts which have reality on their own account, independent of any mind"।[7]

চতুর্থত - প্রত্যেক ধারণা হল একক। ধারণার অন্তর্গত বিশেষ বহু হলেও ধারণা এক। যেমন - ব্যক্তি মানুষ বহু হলেও ধারণারূপে মনুষ্যত্ব 'এক'।

পঞ্চমত - ধারণা অনেক। যেমন - ব্যক্তি মানুষ নিয়ে গঠিত হয় মনুষ্যত্ব ধারণা। আবার বিশেষ বিশেষ বিড়াল নিয়ে গঠিত হয় বিড়ালত্বের ধারণা, গুণবাচক ধারণা, যেমন - লালত্ব, নীলত্ব প্রভৃতি।

ষষ্ঠত - যদিও ধারণা বহু, কিন্তু তা সকলই একই ধারণায় মিলিত হয়। এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ধারণা ব্যাপক ও ব্যাপকতর ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে সকল ধারণার সর্বোচ্চ ধারণা 'The Idea of Good' এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

সপ্তমত - ধারণাগুলি অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর। ধারণা অনেকটা কোন কিছুর সংজ্ঞার মতো। কোন বিষয়ের যখন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়, তখন সংজ্ঞাতে উক্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়। সংজ্ঞাটি অপরিবর্তনীয়। বিশেষ বস্তুর বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে অথবা মেলে না। কিন্তু বস্তুর সংজ্ঞার সঙ্গে না মেলার জন্য সংজ্ঞার কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন - মানুষের সংজ্ঞায় বলা হয়, মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিত্ব ও

---

[7] Ibid, 189.

জীবত্ব যাদের মধ্যে আছে তাদের মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি মানুষকে দেখে সংজ্ঞা নির্ধারণ হয়েছে এমনটি নয়, সংজ্ঞা থেকেই ব্যক্তি মানুষকে চিহ্নিত করা হয়। এবং ব্যক্তি মানুষ উক্ত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়। ঠিক তেমনি ধারণাও অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত। এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু উক্ত ধারণার প্রতিচ্ছবি মাত্র। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর নানা পরিবর্তন পরলক্ষিত হলেও ধারণা অপরিবর্তনীয় এবং বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু বিনষ্ট হলেও ধারণা অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর থাকে।

অষ্টমত - ধারণা হল সবকিছুর সারসত্তা । সারসত্তা বলতে কোন বস্তুর সেই অংশকে বোঝায়, যেটি উক্ত বস্তুর অস্তিত্বের জন্য আবশ্যিক। যেমন - মানুষ হল তাই, যার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিত্ব থাকবে, যেটি না থাকলে মানুষ বলা যাবে না। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিত্ব না থাকলে তাকে মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কিন্তু কোন মানুষের হয়তো একটা হাত নেই, কারোর বা পা নেই, তবু তাদের মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে কোন অসুবিধা থাকে না। কেননা এগুলো মানুষের আবশ্যিক ধর্ম নয়। ঠিক তেমনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য ধারণা স্বীকার আবশ্যিক। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তি মানুষ না থাকলেও ধারণা রূপে মনুষ্যত্ব অস্তিত্ব থাকে। কেননা, তা নিত্য ও অবিনশ্বর।

নবমত - ধারণা পূর্ণতমরূপ। কোন বিশেষ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে নানা অপূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব ধারণার কোন অপূর্ণতা থাকে না। তা পূর্ণতমরূপ। ঠিক তেমনি বিশেষ

বিশেষ ফুল সুন্দর হলেও পূর্ণতম সৌন্দর্যের ধারণার প্রতিচ্ছবি ঐ সুন্দর ফুল। তাদের মধ্যে সুন্দরের তারতম্য থাকলেও সৌন্দর্যের তারতম্য থাকে না।

দশমত - প্লেটো শেষ জীবনে ধারণাকে পিথাগোরাসের মত সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেটি পরবর্তী কালে 'Aristotle' এর লেখাতে পাওয়া যায়, প্লেটোর ডাইলগে এ বিষয়ের উল্লেখ নেই বলে অধ্যাপক স্টেস মত প্রকাশ করেন। এবিষয়ে 'W.T. Stace' তাঁর 'A Critical History of Greek Philosophy' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '... towards the end of his life, Plato identified the ideas with the Pythagorean number...'[8]

৪। প্লেটোর ধারণাতত্ত্বে পূর্ববর্তী দার্শনিকদের প্রভাবঃ– উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, প্লেটো এর সামান্যতত্ত্বে মানুষের দুইধরণের অভিজ্ঞতা হয়। একটি হল অভিজ্ঞতার জগত ও অপরটি হল অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র ধারণার জগত । এবং এটাও পরিষ্কার যে অভিজ্ঞতার জগত ও ধারণার জগত সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্টের। অভিজ্ঞতার জগত পরিবর্তনশীল হলেও ধারণার জগত সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। এবং অভিজ্ঞতার জগত বহু কিন্তু ধারণার জগত এক। ধারণার জগত অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত কিন্তু অভিজ্ঞতার জগত পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। এক্ষেত্রে প্লেটো 'Heraclitus' এর মতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। 'Heraclitus' বলেন যে, আমরা একই নদীতে দুইবার স্নান করতে

[8] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan, 191.

পারি না (We cannot swim twice in the same river)। অর্থাৎ আমরা একই নদীতে দুইবার স্নান করতে পারি না। অর্থাৎ দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার জগত সদাপরিবর্তনশীল এবং কোন কিছুই স্থির নয়। প্লেটো এর মতে, দৃশ্যমান জগত সদা পরিবর্তনশীল এবং ধারণার জগত স্থির ও অপরিবর্তনীয়। কাজেই দৃশ্যমান জগত সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান হয়না, মতামত প্রদান করা যায় মাত্র। যদিও ভৌতবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগত সম্পর্কিত জ্ঞান যথার্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভৌতবিজ্ঞানের পরিধি হল দৃশ্যমান জগত। কিন্তু একজন বিদগ্ধ দার্শনিকের কাছে অধিবিদ্যার হাতছানি বারবার বিচলিত করবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জগত যথার্থ, অপরিবর্তনীয় বলতে দোষ নেই। কিন্তু অধিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃশ্যমান জগত সদা পরিবর্তনশীল এবং ধারণার জগত অবিনশ্বর, শাশ্বত এটাই স্বাভাবিক। এবং উক্ত বিষয়ক জ্ঞান সর্বদা বুদ্ধিলব্ধ। যেটা অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে ‘Denotative Value’ বা নির্দেশকমূল্য আকারে পাওয়া সম্ভব নয়। প্লেটো ‘Eleatics’ দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরমসত্ত্বার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, যে পরমসত্ত্বা হবে অপরিবর্তনীয়, নিত্য। এবং ‘Socrates’ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উক্ত ধারণা সম্পর্কিত মত প্রকাশ করেন। যে ধারণা আবার মিলিত হয় এক পরমসত্তায়। উক্ত পরমসত্তা হল, ‘Good’ বা ‘God’। অর্থাৎ প্লেটো ‘Heraclitus’ এর মতবাদ থেকে জাগতিক ক্ষনিকত্ব উল্লেখ করেন এবং এই ক্ষনিকত্বের মূল হিসাবে ‘Socrates’ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেন যে, দৃশ্যমানজগত পরিবর্তনশীল হলেও তার উৎস হল ধারণার জগত। সেই সঙ্গে

'Eleatics' দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেন যে উক্ত সকল ধারণার উৎস এক পরমসত্তা 'Good' বা 'God'।

কিন্তু 'Plato'-এর শিষ্য 'Aristotle' তাঁর মতের নানা ত্রুটি নির্ণয় করে তার সংশোধনের মাধ্যমে গুরুর মতকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তা দেখানোর চেষ্টা করবো।

পঞ্চম অধ্যায়

অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যায় সামান্য

১। অধিতত্ত্ব প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলঃ– প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের সমালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য অ্যারিস্টটল। তবে প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের বিরুদ্ধে অ্যারিস্টটলের সমালোচনা, নাকি গুরুকে মান্যতা দিয়ে তাঁর মতের সর্বান্তকরণে ত্রুটি দূরীকরণের চেষ্টা, তা বুঝতে গেলে অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যাকে গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। যদিও অ্যারিস্টটল তাঁর অধিবিদ্যক আলোচনাকে 'Metaphysics' না বলে 'First Philosophy' অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনার বিষয় বলেন এবং 'Physics' এর আলোচনার বিষয় হল দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা। পরবর্তীকালে 'Andronicus' অ্যারিস্টটল এর প্রবন্ধ সংগ্রহ করে সংকলনগ্রন্থ প্রস্তুত করেন । তখন 'Physics' এর পর আদি দর্শন সংকলন করায় 'Metaphysics' নামকরণ হয়। যদিও সেটি আকস্মিক ভাবেই করা হয়। ঘটনাক্রমে উক্ত সংকলন গ্রন্থের শুরুতেই 'Metaphysics' সংকলন করা হয়। যদিও এটা বলাই যায় যে, অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে 'Physics' বা পদার্থ বিদ্যার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই তাকে 'First Philosophy' বা মুখ্য দর্শন বা মুখ্য পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনার বিষয় বলা যায় বা প্রথম নীতি (First Principle) বা প্রথম কারণ (First Cause) । অ্যারিস্টটল যেটিকে বলেন 'Ta meta ta physica'। মূলত অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যক

আলোচনা শুরু হয় তাঁর গুরু প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের সংশোধনের মাধ্যমে। “It is difficult to decide at what point to begin an account of Aristotle’s metaphysics, but perhaps the best place is his criticism of the theory of ideas, and his own alternative doctrine of universal” ।[1] এবিষয়ে একটা কথা মনে হয় কম বেশি অনেকেই একমত হবেন যে, অ্যারিস্টটল এর ‘First Philosophy’ যা পরবর্তীকালে ‘Andronicus’ এর দ্বারা ‘Metaphysics’ গ্রন্থ নামে সংকলিত হয়েছে, সেটি একাধিকবার পাঠ করেও যথার্থভাবে ‘Aristotle’ এর অধিবিদ্যক মত সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা বেশ কঠিন। সুতরাং আমরা চেষ্টা করবো যতটা সম্ভব মূল গ্রন্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের সহযোগিতায় বিষয়টা অনুধাবন করার। তাঁর মতে, মানুষ স্বভাবতই জানতে চায় (All men by nature desire to know) । গবেষণার উপাধি অর্জনের জন্য, নিজের পিতামাতার সন্মান বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান অর্জন করি। আবার পড়তে পড়তে বা লিখতে লিখতে ক্লান্তি এলে ঘরের বাইরে উঠানে পাইচারি করি, কখনও চৌবাচ্চাতে ছোট ছোট পোকার তিড়িং বিড়িং লাফানো চোখে পড়ে, তাকিয়ে দেখতেই থাকি, ঐ চৌবাচ্চায় তাদের জন্ম হল কি করে তাও ভাবি। আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাদের এলোমেলো ভাবে ছোট বাল্বের মতো আলো বিকিরণও দেখতে ভালই লাগে, আবার কিছুক্ষণ পরে কিভাবে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও গবেষণা শেষ হবে তারও ভাবনা উপস্থিত হয়। আসলে আমরা কারণে অকারণে জানতে ভালোবাসি। ছোটবেলায়

[1] Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, 159.

কিকরে রেডিও, টর্চ লাইট ঠিক করা যায় জানতাম না, কিন্তু আমরা প্রায় সকলেই মনে হয় কম বেশি তা খুলে দেখার চেষ্টা করতাম। আবার কতৃত্ব নিয়েও, অভিভাবকত্ব নিয়েও উচ্চপদস্তের কথা কল্পনা করতে থাকি। বাড়ির কর্তা বাবা। কর্মক্ষেত্রের কর্তা অফিস প্রধান। রাজ্যের কর্তা মুখ্যমন্ত্রী, দেশের কর্তা প্রধানমন্ত্রী, তাহলে সমগ্র জগতের কেউ-কি কর্তা আছেন ? এভাবে এলোমেলো কতো ভাবনাই যে মাথায় ঘোরে তার কোন শেষ নেই। কাজেই মানুষের স্বভাব যে জানতে চাওয়া তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ আমরা যেমন প্রয়োজনে জানি, তেমনি অনেক সময় জানার জন্যও জানি। আমরা বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করার জন্যে যেমন বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করি, তেমনি কোন কারণ ছাড়াই অনেকসময় জানতে চাই। প্রকৃতি মানুষকে যে সকল ইন্দ্রিয় দিয়েছেন সেগুলি সবই জীবনের প্রয়োজনে বিশেষ কার্যকরী। এগুলির মধ্যে দর্শন ইন্দ্রিয় তুলনামূলক বেশি প্রয়োজনীয়। আবার প্রকৃতি যে শুধু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকেই ইন্দ্রিয় দিয়েছেন তা নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণীকেও দিয়েছেন। উক্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলে সংবেদন উৎপন্ন হয়, সংবেদন থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রাণীর স্মৃতি উৎপন্ন হয়, কোন কোন প্রাণীর তা হয় না। যাদের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তারা অন্যান্য প্রাণীর থেকে বেশি বুদ্ধিমান হয় এবং মানুষের বুদ্ধিশক্তি অন্যান্য প্রাণীর থেকে উন্নত। ফলত তারা যুক্তিবাদী, চিন্তাশীল হয়ে থাকে। উক্ত যুক্তিমূলক চিন্তার দ্বারা মানুষ তার জ্ঞানভাণ্ডার উন্নত থেকে উন্নততর করে। তবে মানুষের জানার সর্বোচ্চ স্তর হওয়া উচিত প্রজ্ঞাকে জানা (Knowledge of wisdom)। অ্যারিস্টটলের মতেও সর্বোচ্চ স্তরের জানা বা জ্ঞান হল

প্রজ্ঞাকে জানা (Knowledge of Wisdom) এবং তা সর্বোচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান বা প্রথম পর্যায়ের দর্শন (First Philosophy) ।

প্রসঙ্গত অ্যারিস্টটলের পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান বা দর্শনকে বিভাজন করে দেখা হয়নি। অ্যারিস্টটল প্রথম বিভাজনটা করেন। যদিও তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনকে একই বলেন। উক্ত বিজ্ঞান বা দর্শনের দুই ভাগ। যথা - প্রথম দর্শন (First Philosophy) ও দ্বিতীয় দর্শন (Second Philosophy)। যে সকল আলোচনার বিষয় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী, নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয়ের আলোচনাতে সীমাবদ্ধ থাকে, তা হল দ্বিতীয় পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনা। যেমন - পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি যেখানে দৃশ্যমান জগতের গতি ও পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের দর্শনের (First Philosophy) আলোচ্য বিষয় কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় বা বস্তু নয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় হল সর্বসাধারণ সত্তা (Being-qua-being) । এবং সর্বসাধারণের নীতি কোন বিশেষ নীতি নয় এবং তা কোন অন্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা স্বসত্তাবান (Being in itself)। সকল জ্ঞানের কারণ অনুসন্ধান করে প্রথম দর্শন, সকল কারণের কারণ হল প্রথম দর্শন। সেই কারণে অ্যারিস্টটল কখনো কখনো প্রথম দর্শনকে ধর্মদর্শন বা 'Theology' বলেছেন। যদিও 'Being-qua-being' বা সারসত্তা বলতে তিনি কি বোঝেন তা খুবই অস্পষ্ট। এক্ষেত্রে তিনি বলেন সকল সত্তার মুলাধার হল দ্রব্য (Substance)। উক্ত দ্রব্যকে অ্যারিস্টটল তিন ভাগে ভাগ করেন। যথা - চিরন্তন নয় এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য, চিরন্তন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত চিরন্তন

দ্রব্য। প্রথম পর্যায়ের দর্শন উক্ত ইন্দ্রিয়াতীত চিরন্তন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এবং সকল বিজ্ঞানের মূল বিজ্ঞান হল প্রথম পর্যায়ের দার্শনিক আলোচনার বিষয়। একে আবার সর্বসাধারণ সত্তার আলোচনার বিষয়ও বলে। যেখানে সত্তার সাধারণ নীতিসমূহ, যেমন - চিন্তার মূল সূত্রসমূহ - তাদাত্ম্য নীতি (Law of Identity), নির্মাধ্যম নীতি (Law of Excluded Middle) ও বিরোধবাধক নীতি (Law of non-contradiction) প্রভৃতি। অর্থাৎ অ্যারিস্টটলের মতে চিন্তার মূল সূত্রসমূহ (Laws of Thought) সারসত্তার মূল সূত্র (Being qua being), যেগুলি নিয়ে প্রথম পর্যায়ের দর্শন আলোচনা করে। উক্ত বিষয় আরও পরিস্কার হবে যদি আমরা তাঁর দ্বারা কৃত গুরুর অর্থাৎ প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের সমালোচনা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি।

২। প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলঃ- অ্যারিস্টটল প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের সমালোচনায় বলেন যে, **প্রথমত** - প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব বস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেনা। দার্শনিকের কাছে অন্যতম সমস্যাধীন প্রশ্ন হল, এই জগতের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাখ্যা কি ? কিন্তু প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব তার কোন সদুত্তর দিতে অক্ষম। নিত্য, অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় ধারণা থেকে কিভাবে এই অনিত্য, নশ্বর, পরিনামী, দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হয়, তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব দিতে অক্ষম। নিত্য পদার্থ কি ভাবে উৎপত্তির কারণ হয় ? এবং নিত্যপদার্থ থেকে উৎপন্ন পদার্থ অনিত্য কেনই বা হয়, তার সদুত্তর প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব দিতে পারে না। আসলে এক্ষেত্রে প্লেটোর ধারণাতত্ত্বে

‘Heraclitus’ এর জাগতিক ক্ষনিকতত্ত্বের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্লেটো এটাই মনে করেন যে, দৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই ক্ষনিক ও নিত্য ধারণার অনুলিপি মাত্র। অনুলিপির সঙ্গে যদিও তার মূলের সম্পূর্ণ সদৃশ থাকে, কিন্তু অনুলিপি মূল নির্ভর। মূলের অস্তিত্ব আছে বলেই অনুলিপির প্রসঙ্গ আসে। কাজেই দৃশ্যমান জগত যদি নিত্য ধারণার অনুলিপি হয় তাহলে সে অর্থে ধারণারই যথার্থ অর্থে অস্তিত্ব আছে। এবং দৃশ্যমান জগত ধারণার জগতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য, ধারণার জগতের সঙ্গে দৃশ্যমান অনুলিপির জগতের সম্বন্ধ কি ? তার ব্যাখ্যা প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব দিতে পারে না। (Even admitting that, say the idea of whiteness exists, we cannot see how it produces white objects)।[2]

দ্বিতীয়ত - প্লেটোর ধারণাতত্ত্বে ধারণা ও বস্তুর সম্বন্ধের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না বলে অ্যারিস্টটল মনে করেন। প্লেটো কখনো বস্তুকে ধারণার প্রতিচ্ছবি (copy) বলেছেন। আবার কখনো বলেছেন যে, বস্তু ধারণাতে অংশগ্রহণ করে। ধারণার প্রতিচ্ছবি যদি বস্তুজগত হয় তাহলে ধারণাকেও দৃশ্যমান জগতে অবস্থান করতে হবে। কেননা আসল ছাড়া তার প্রতিচ্ছবি (copy) গঠিত হতে পারেনা। আবার ধারণায় যদি বস্তুর অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ আসে, তাহলে ধারণাকেও বস্তুর মতো দেশ-কালের জগতে অবস্থান করতে হয়।

---

[2] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan Publishers, 262.

আসলে বস্তুর সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্লেটো অযৌক্তিক কাব্যিক রূপক ব্যবহার করে বলেছেন যে, ধারণার প্রতিচ্ছবি হল দৃশ্যমান জগত।

তৃতীয়ত - যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বস্তুজগত ধারণার জগতের প্রতিচ্ছবি। তবুও ধারণার জগত ও বস্তুজগতের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকায় বস্তুজগত যে ধারণার জগতের প্রতিচ্ছবি তা বলা যায় না। কেননা, ধারণার জগত গতিহীন, নিত্য কিন্তু বস্তু জগত গতিশীল ও অনিত্য। গতিহীন ধারণার যা প্রতিচ্ছবি তা নিশ্চই গতিহীন হবে। কিন্তু বস্তুজগত তার বিপরীতধর্মী। অর্থাৎ ধারণার সঙ্গে বস্তুজগতের সম্বন্ধস্থাপনে প্লেটোর ধারণাতত্ত্ব অক্ষম। প্লেটো যদি তাঁর ধারণাতত্ত্বে ধারণার এমন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতেন যে, ধারণা গতিশীল তাহলে তা থেকে বলাই যেত যে, ধারণার প্রতিচ্ছবিরূপ এই জগত গতিশীল। যেমন - লাইবনিজের মনাদতত্ত্বে যদিও মনাদ্‌গুলি গবাক্ষহীন অর্থাৎ বাইরের কোন কিছুর দ্বারা মনাদ্‌গুলি প্রভাবিত নয় কিন্তু পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাতত্ত্বের দ্বারা লাইবনিজ মনাডের গতিশীলতা ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্লেটোর ধারণাতত্ত্বে তেমন কোন পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নীতি ধারণার মধ্যে না থাকায় জগতের গতিবিধি ব্যাখ্যায় তা অক্ষম।

চতুর্থত - প্লেটো তাঁর ধারণাতত্ত্বের দ্বারা জগতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। দৃশ্যমান বস্তুদিয়ে জগত গঠিত এবং তা সবই ক্ষণিক। এই ব্যাখ্যার দ্বারাই জাগতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অহেতুক ধারণার জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করায় ধারণার সঙ্গে বস্তুজগতের সম্বন্ধ স্থাপনে অক্ষম হচ্ছে। অনেকটাই যেন, প্রতিটি

জাগতিক বস্তুই আসল ধারণার নকল স্বরূপ। এবিষয়ে ‘Aristotle’ বলেছেন যে, ‘Plato is like a man who unable to count with a small number, things that he will find it easier to do if he doubles the number’।[3]

পঞ্চমত - ধারণাকে প্লেটো যদিও অতীন্দ্রিয় (non-sensuous) বলেছেন, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে। (The ideas are supposed to be non-sensuous, but they are, in fact, sensuous.)।[4] প্লেটো তাঁর ধারণাতত্ত্বে বস্তুজগতের ব্যাখ্যা দিতে অতীন্দ্রিয় এক ধারণার জগতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এবং পরিশেষে বস্তুজগতের সঙ্গে ধারণার জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় অপারগ হয়ে কোন নীতি ছাড়াই বস্তুজগতকে গ্রহণ করে তাকেই অতীন্দ্রিয় বলেছেন। যেমন - বস্তুঘোড়া ও ধারণারূপে আদর্শ ঘোড়া, ব্যক্তিমানুষ ও ধারণারূপে আদর্শ মানুষের মধ্যে প্রভেদ আমরা উপলব্ধিকরবো কি করে, যদি আদর্শ মানুষ বা আদর্শ ঘোড়া প্রত্যক্ষগোচর না হয় ।আসলে ব্যক্তিঘোড়া ও সাধারণ ধারণারূপে ঘোড়া যখনই আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবো, তখন এটা জরুরি হয়ে পড়ে ব্যক্তি ঘোড়ার মতো সাধারণ ধারণারূপে ঘোড়ার প্রত্যক্ষগ্রাহ্যতা। নচেৎ তা নেহাত অধিবিদ্যার দোহাই দিয়ে অতীন্দ্রিয় বলে গ্রহণ করানোর ব্যর্থ প্রয়াস। **ষষ্টত** - তৃতীয় মানবের যুক্তি (Third man argument) - B. Russell এর মতে, ‘The

[3] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan Publishers, 263.
[4] Ibid, P-263.

strongest argument is that of the third man'।[5] তৃতীয় মানবের যুক্তিটি এরূপ যে, প্লেটোর মতে, যেখানেই সমধর্মীতা সেখানেই ধারণার প্রসঙ্গ। যেমন - সকল মানুষের মধ্যে সাধারণ ধর্ম উপস্থিত থাকায় ধারণারূপে মানুষের কল্পনা। কিন্তু কোন ব্যক্তি মানুষ যদি এই কারনেই মানুষ রূপে পরিচিত হয় যে, সে অন্য কোন আদর্শ মানুষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা আদর্শ মানুষের অনুলিপি। তাহলে উক্ত আদর্শ মানুষ এই কারণে আদর্শ মানুষ যা কোন আদর্শতর মানুষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এভাবে চলতে থাকলে তা অনাবস্থা দোষে পরিণত হয় (Fallacy of infinite Regress)।

সপ্তমত - প্লেটোর মতে, ধারণা বস্তু অতিরিক্ত স্বতন্ত্র। কিন্তু অ্যারিস্টটল এর মতে, ধারণা ব্যক্তি অতিরিক্ত নয় বরং ব্যক্তিতেই ধারণার অবস্থান। (The idea, as the universal can only exist in the particular)।[6] ব্যক্তি মানুষের সাধারণ ধর্ম মনুষ্যত্ব নামক সামান্য বা ধারণা, তা ব্যক্তিমানুষ বহির্ভূত কোন রহস্যময় জগতে অবস্থান করেনা। বরং ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সাধারণ ধর্ম মনুষ্যত্ব ব্যক্তিতেই অবস্থান করে। ধারণারূপে মানুষ ব্যক্তিমানুষ বহির্ভূত কিছু নয়।

অষ্টমত - প্লেটোর ধারণাতত্ত্বে অনেকের মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত ধর্ম দেখে তাদের সমান্তরাল এক আদর্শ ধারণা স্বীকার করা হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে টেবিলে ঘটাভাব, জলে অগ্নির অভাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভাব সাধারণভাবে উপস্থিত থাকায় ধারণারূপে পৃথক

---

[5] Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, 159.
[6] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan Publishers, 264.

অভাবের ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। ঠিক তেমনি সম্বন্ধ, অর্থাৎ আমি দাদার থেকে ছোট, রাম যদুর থেকে বড়ো প্রভৃতি সম্বন্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকায় ধারণারূপে সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সাধারণত অভাব ও সম্বন্ধকে সদবস্তুরূপে স্বীকার করা হয়না। সামান্য ধারণা সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মতবাদ এমনই যে, সামান্যই প্রকৃতপক্ষে পরমসত্তা যদিও তা ব্যক্তিবহির্ভূত নয়। (... the fundamental principle of which is that the universal is indeed the absolute reality, but that it is a universal which exists only in the particular.) ।[7] এবং এপ্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল এর মত আরও বিস্তর জানতে হলে তাঁর দ্রব্য সম্পর্কিত মত নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। দ্রব্য সম্বন্ধে প্লেটোর মত হল, দ্রব্য হল বস্তুর এমনই সারসত্তা যা নিত্য, স্বনির্ভর এবং গতিহীন। অর্থাৎ ধারণাই প্রকৃতপক্ষে দ্রব্য।

৩। সামান্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলঃ– অ্যারিস্টটল প্লেটোর উক্ত ধারণা সম্পর্কিত মতবাদকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করেন। তিনি প্লেটোর মতো ধারণা বা সামান্যের ভিন্ন জাগতিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তিনি সামান্যকে ব্যক্তি (Individual) বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা বলে স্বীকার করেন না। তিনি ধারণাকে ব্যক্তির অন্তঃসূত (Immanent) বলে মত প্রকাশ করেন। যেমন - ব্যক্তি মানুষ বহির্ভূতভাবে মনুষ্যত্ব সামান্য কোন ভিন্ন জগতে অবস্থান করেনা। মনুষ্যত্ব সামান্য হল ব্যক্তি মানুষের আকার। যা সকল মানুষের ক্ষেত্রে

[7] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan Publishers, 265.

একই। এই আকারই হল সামান্যধর্ম এবং উপাদান হল বিষয়। পরবর্তী অধিবিদ্যক আলোচনায় এবিষয়ে তিনি সবিস্তর আলোকপাত করেছেন।

এপ্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের কারণ (Causation) সম্পর্কিত মতবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারিস্টটল 'Physics' এবং 'Metaphysics' নামক দুটি গ্রন্থেই চার কারণ তত্ত্ব (Theory of Four Causes) আলোচনা করেছেন, যদিও উভয় ক্ষেত্রে একই মত প্রকাশ পেয়েছে বলে ব্যাখ্যাকাররা মনে করেন। অ্যারিস্টটলের মতে, দার্শনিকের যথার্থ জ্ঞানীয় অনুসন্ধানের বিষয় হল প্রজ্ঞার জ্ঞান (Knowledge of Wisdom) এবং প্রজ্ঞাকে জানা মানেই মূল কারণকে জানা (First Cause) । আর মূল কারণকে জানতে গেলে অ্যারিস্টটলের চার কারণতত্ত্ব গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

'Metaphysics' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কারণ শব্দটির চারটি বাচ্যার্থ নির্দেশিত হয়েছে, যথা – ১. কারণ হল তাই যার থেকে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়। ২. কারণ হল কোন বস্তুর আকার বা নমুনা। ৩. কারণ হল তাই যা কোন বস্তুর গতি বা স্থিতির উৎস। ৪. কারণ হল নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল।[৪]

উক্ত কারণের চারটি অর্থ গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে কারণের যথার্থ স্বরূপ নির্দেশ করা যাবে। সাধারণত প্রত্যেক কার্যের কারণ থাকে। (যদিও অ্যারিস্টটল যে First Cause বা

[৪] অভীক, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; সংক্ষিপ্ত রূপরেখা,* সাঁতরা পাবলিকেশন প্রা. লি., ৫৯।

চরম কারণের উল্লেখ করেছেন তা অ-কারণ অর্থাৎ তার কোন কারণ নেই)। অ্যারিস্টটলের মতে কারণ প্রকারের। যেগুলিকে B. Russell তাঁর গ্রন্থে একটি উদাহরণের সাহায্যে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।[9] যেখানে জ্ঞানতত্ত্ব থেকে অধিবিদ্যায় উত্তরণের বর্ণনা আছে।

কোন ভাস্কর যখন মূর্তি গঠন করেন তখন তার **উপাদানগত কারণ (Material Cause)** হয় পাথর বা যা দিয়ে মূর্তিটি গড়া হচ্ছে তা। অর্থাৎ সেই উপাদান যা দিয়ে মূর্তি গড়া হচ্ছে, এবং যে মূর্তিটির আকার চিত্রকর মনের মধ্যে কল্পনা করেছেন তাহলো উক্ত মূর্তির **আকারগত কারণ** (Formal Cause) । এবং যিনি অর্থাৎ ভাস্কর ও তার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি হল উক্ত মূর্তি গঠনের **নিমিত্ত কারণ** (Efficient cause) এবং উক্ত নিমিত্ত কারণের মধ্যে পরিবর্তন কাজ করে। অর্থাৎ ছিল একটা পাথরের খণ্ড সেটা থেকে হল কোন এক মূর্তি । এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাস্কর মূর্তিটি গঠন করতে চেয়েছেন তা সম্পন্ন হওয়ায় এটা সহজেই বলা যায় ভাস্করই মূল কাণ্ডারি যিনি মূর্তির পূর্ণরূপ দান করেছেন। অর্থাৎ এ অর্থে ভাস্করই হল **চরম কারণ** (Final Cause)। যদিও অ্যারিস্টটল তাঁর চারটি কারণকে শেষ পর্যন্ত দুটি কারণে রূপান্তরিত করেন। সে দুটি কারণ হল **আকারগত কারণ** (Formal cause) **ও উপাদানগত কারণ** (Material cause) । তিনি এটা দেখাতে চান যে আকারগত কারণ, নিমিত্ত কারণ ও চরম কারণ এগুলি সবই আকারগত কারণের

[9] Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, 165.

অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, (ক) আকারগত কারণ হল কোন বস্তুর সারধর্ম। আর চরম কারণও বস্তুর সারধর্মকে বোঝায়। সুতরাং আকারগত কারণ ও চরম কারণ একই কারণের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। (খ) নিমিত্ত কারণ (Efficient Cause) এবং চরম কারণ (Final Cause) একই, কেননা নিমিত্ত কারণ হল তাই, যা হতে হবে এবং চরম কারণ হল তাই, যা নিমিত্ত কারণ হয়ে ওঠে বা যা হওয়ার লক্ষে নিমিত্ত কারণ কার্যকারী হয়। সুতরাং আকারগত কারণে চরম কারণকে ও নিমিত্ত কারণকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। আসলে কারণতত্ত্বের ব্যাখ্যাত বিষয় বস্তু নয়, বরং সেই প্রক্রিয়াকে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বস্তুটি উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় যে উপরিক্ত কারণগুলি আসলে চারটি কারণই নয়, একই কারণের চারটি রূপ। যদি তা না হতো, তাহলে একটি কারণকে অন্য কারণে অন্তর্ভুক্ত করা যেত না। আসলে এই কারণগত ব্যাখ্যায় যেমন যান্ত্রিকতা প্রকাশ পায় তেমনি উদ্দেশ্যমুখীতাও প্রকাশ পায় (... Aristotle's theory, as being philosophy rather than science, includes both the principles of mechanism and teleology.)।[10] যান্ত্রিকতার দ্বারা জাগতিক কার্য-কারণের ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং উদ্দেশ্যমুখীতার দ্বারা চরম কারণের ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে একমত হবেন না যে, কোন জড়বস্তু উক্ত কারণের মধ্য দিয়ে উত্তরণের মধ্য দিয়ে চরম কারণে উপনীত হওয়াই জড়বস্তুর লক্ষ্য। এপ্রসঙ্গে

---

[10] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan Publishers, 271.

‘W.T. Stace’ বলেন যে, ‘J.S. Mill’ প্রদত্ত কারণের সংজ্ঞার সঙ্গে যদি আধুনিক বিজ্ঞানের কারণের লক্ষণকে একই বলি, তাহলে তা অ্যারিস্টটলের মতের সঙ্গে অমিল সৃষ্টি করে। কেননা, কারণের সংজ্ঞায় মিল (Mill) বলেন যে, কারণ হল কোন ঘটনার অপরিবর্তনীয়, শর্তহীন নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা। এটা মানলে অ্যারিস্টটলের চরম কারণ বাদ পড়ে যাবে, কেননা তা সকল ঘটনার শেষে আসে, পূর্বে নয়। আবার আকারগত কারণ বাদ পড়ে যাবে কেননা আকার বা ধারণাকে সাধারণত কোন বিজ্ঞানে কারণের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সুতরাং কেবল উপাদান ও নিমিত্ত কারণ পড়ে থাকে, যাকে আধুনিক বিজ্ঞানে জড় ও শক্তির সঙ্গে অনুরূপ বলা যায়। যদিও কারোর কারোর মতে, নিমিত্ত কারণও যথার্থ অর্থে বিজ্ঞানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়, অ্যারিস্টটল ঠিক সে অর্থে ব্যবহার করেননি। বিজ্ঞানে নিমিত্ত কারণ হল সেই শক্তি, যা বস্তুর মধ্যে গতি উৎপন্ন করে, যদিও তা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক। কিন্তু অ্যারিস্টটলের কারণতত্ত্বে নিমিত্ত কারণ যান্ত্রিক নয়, উদ্দেশ্যমূলক, যা আকার ও উপাদান কারণকে চরম কারণের লক্ষে চালিত করে। যদিও তার জন্য অ্যারিস্টটলের মতের কোন ন্যূনতা প্রকাশ পায় না বলে ‘W.T. Stace’ মত প্রকাশ করেন। আসলে অ্যারিস্টটলের কারণ তত্ত্বে যান্ত্রিকতা (Mechanism) ও উদ্দেশ্যমুখীতা (Teleology) উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে কারণতত্ত্বে শুধুই যান্ত্রিকতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এখানেই বোধহয় বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য। উক্ত কারণ সম্পর্কিত মতবাদের সর্বশেষ কারণ হল চরমকারণ বা ‘Final Cause’। যেটিকে অ্যারিস্টটল ‘God’ বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন । এবং ‘God’ কে তিনি ‘Unmoved Mover’ বলে উল্লেখ

করেন। যা সমগ্র জাগতিক পরিবর্তনের কারণ। 'God' হলেন চরম আকার (Absolute Form) যেখানে উপাদান নেই (Matter less) । 'God' সমগ্র পরিবর্তনের কারণ এই অর্থে যে, এই পরিবর্তন আকার থেকে উপাদানের দিকে হয় এবং জগত সৃষ্টি হয়। এবং উক্ত উপাদান সর্বদা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সর্বদা আকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কারণ চরম আকার 'God' । অর্থাৎ মঙ্গলের দিকে সমগ্র জাগতিক পরিবর্তন ধাবমান। কেননা 'God' হল মঙ্গলময়। যদিও উপাদান সম্পূর্ণ আকারে পরিণত হতে পারে না। এবিষয়ে অধ্যাপক 'Frank Thilly' বলেন " God thus constitutes the one exception to the principle that matter and form are inseparable"।[11] এভাবে সমগ্র জাগতিক গতি ও পরিবর্তনকে অ্যারিস্টটলের মতবাদে ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু যদিও এটি অ্যারিস্টটল এর মতবাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যার একটা অংশমাত্র। তাঁর মতবাদের অন্য দিক হল আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ। (This would, however, be a one- sided view of Aristotle's religion; he has also the Greek love of static perfection and preference for contemplation rather than action. His doctrine of the soul illustrates this aspect of his philosophy.)।[12]

---

[11] Frank, *A History of Philosophy*, Henry Holt and Company, 109.

[12] Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, 165.

অ্যারিস্টটলের সামান্য সম্পর্কিত মত আরও স্পষ্ট হয় তাঁর দ্রব্য (Substance) সম্পর্কিত আলোচনায় । ‘Metaphysics’ গ্রন্থে দ্রব্য বলতে তাকেই বোঝানো হয়েছে যা চূড়ান্ত অর্থে প্রাথমিক। **প্রথমত** - সংজ্ঞার দিক থেকে প্রাথমিক অর্থাৎ দ্রব্য ছাড়া যে কোন বিষয়ের সংজ্ঞা দিতে গেলে দ্রব্যের ধারণাকে প্রয়োজন অর্থাৎ দ্রব্য ছাড়া কোন কিছুর সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ। যদিও দ্রব্যের সংজ্ঞার জন্য অন্য কোন কিছুর ধারণার প্রয়োজন নেই। এই অর্থে দ্রব্যের ধারণা হল চরম অর্থে প্রাথমিক। **দ্বিতীয়ত** - জ্ঞানের দিক থেকে দ্রব্য হল প্রাথমিক। কেননা কোন বস্তুকে জানতে গেলে তাকেই জানতে হয়, তার গুনকে নয় বা গুনগুলিকে জানাটা যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তাঁর থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ওই বস্তুকে জানা। সুতরাং জ্ঞানের দিক থেকেও দ্রব্যের ধারণা হল প্রাথমিক। **তৃতীয়ত** - সময়ের দিক থেকেও দ্রব্যকে আগে স্থান দিতে হয়। কেননা সেক্ষেত্রে দ্রব্য হল স্বয়ং সত্তাবান, তার অস্তিত্বের জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং দ্রব্য হল সত্তা। এপ্রসঙ্গে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জড়দ্রব্য কি দ্রব্য হতে পারে ? অ্যারিস্টটল বলবেন না। কেননা, যদিও জড়পদার্থকে ভাবা হয় মূল বস্তু, এবং সকল গুন বর্জিত ভাবে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু তা নিজে স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ তাই তা দ্রব্য।

তাহলে এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল সামান্যকে (Universal) কি দ্রব্য বলা যাবে ? মুখ্য অর্থে অ্যারিস্টটল দ্রব্য বলতে যা ব্যক্ত করেন সে অর্থে সামান্য (Universal) দ্রব্য নয়। কেননা, সাধারণত সামান্য বলতে তাকেই বোঝায়, অনেক বস্তুর মধ্যে সমধর্মের উপস্থিতি। বা

সামান্য ধর্ম হল তাই যা বিভিন্ন বস্তুকে সমধর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু স্বরূপগতভাবে দ্রব্য হল তাই, যা কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা বস্তুগত ধর্ম। সুতরাং কোন শ্রেণীগত ধর্ম দ্বারা দ্রব্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু গৌণ অর্থে সামান্যকে দ্রব্য বলা যায়। 'এই অর্থে দ্রব্য হল আকারগত উপাদান অথবা বিশিষ্ট সারধর্ম, যা সার্বিক প্রত্যয়ের অনুরূপ' (...Substance in the secondary sense is the formal element or specific essence that corresponds to the universal concept.)।[13]

৪। **অ্যারিস্টটলের সামান্যতত্ত্বের সীমাবদ্ধতাঃ–** কিন্তু অ্যারিস্টটল এর সামান্য সম্পর্কিত মতবাদ (যেটা মূলত প্লেটো এর ধারণাতত্ত্বকে খণ্ডন করে গড়ে উঠেছে) তা সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা তার মতবাদে নানা অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথমত - প্লেটো তাঁর ধারণাতত্ত্বে দুটি ভিন্ন জগত, ধারণার জগত ও দৃশ্যমান বস্তুজগতের উল্লেখ করলেও তাদের সম্বন্ধের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম বলে অ্যারিস্টটল মনে করে বস্তুজগতকেই একমাত্র জগত বলে গন্য করেছেন। কিন্তু অ্যারিস্টটল দুটি ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও একই জগতে পরস্পর বিরোধী স্বভাবধর্মী দুটি পদার্থ স্বীকার করেছেন। যথা - আকার ও উপাদান। উক্ত আকার ও উপাদান পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবের

[13] Copleston, *A History of Philosophy*, Vol- I, Image Books, 303.

হওয়ায় তাদের মধ্যে সম্বন্ধ গঠন করা অসম্ভব। অর্থাৎ প্লেটো এর মতো অ্যারিস্টটল এর সামান্য সম্পর্কিত মতবাদ দোষদুষ্ট।

দ্বিতীয়ত - অ্যারিস্টটল প্লেটোর ধারণা সম্পর্কিত মতবাদে এই জন্য দোষদুষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন যে, বিশুদ্ধ আকার (যার প্রতিলিপি হল বস্তুজগত) একটি বিমূর্ত ধারণামাত্র, যার সঙ্গে উপাদান যুক্ত না হলে সদবস্তু হতে পারেনা। তাই অ্যারিস্টটলের মতে, আকার ও উপাদান মিলিত বস্তু হল সদবস্তু এবং তা বস্তুজগতেই অবস্থিত। এমন কোন কাব্যিক জগত নেই যেখানে ধারণাগুলি অবস্থান করে। কিন্তু অ্যারিস্টটল তাঁর ধারণা সম্পর্কিত মতবাদে 'Formless Matter' অর্থাৎ আকারশূন্য উপাদানের উল্লেখ করেছেন তা অনেকটাই প্লেটোর ধারণা নামক ভিন্ন জাগতিক সৎ বস্তুর অনুলিপির অনুরূপ । আবার 'Matter less Form' এর উল্লেখ করেছেন (যথা - God) যা অনেকটা প্লেটোর ধারণার জগতে অবস্থিত ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ অ্যারিস্টটল প্লেটোর মতবাদের সংশোধন করতে গিয়ে তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়।

তৃতীয়ত - অ্যারিস্টটল উপাদান ও আকারকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি মৌলিক পদার্থরূপে গন্য করলেও আকারকে উপাদানের তুলনায় যথার্থ বলেছেন এবং চরম আকার হিসেবে 'Unmoved Mover' God-কে উল্লেখ করেছেন। এপ্রসঙ্গে 'B. Russell' বলেন, "Only God consists of form without matter. The world is continually evolving towards a greater degree of form, and thus becoming progressively

more like God"।[14] এবার যদি এর পাশাপাশি প্লেটোর ধারণা সম্পর্কিত মতবাদ পর্যালোচনা করি তাহলে লক্ষ্য করবো, দৃশ্যমান বস্তুজগৎ যা ধারণার জগতের প্রতিলিপি মাত্র, এবং উক্ত ধারণাগুলি পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত এবং সর্বোচ্চ ধারণা হল 'Good' বা মঙ্গলের ধারণা, যাকে প্লেটো God-এর সঙ্গে অভিন্ন বলেছেন। অর্থাৎ অ্যারিস্টটলএর মতেও চরম কারণ (Unmoved Mover) হল 'God', প্লেটোর মতেও তাই। সুতরাং অ্যারিস্টটলকে যতটা প্লেটো বিরোধী মনে হয় তিনি ততটা প্লেটো বিরোধী নন, বরং বিশেষভাবে প্লেটোর মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত।

এপ্রসঙ্গে W.T. Stace বলেছেন যে, "My conclusion , then, is that it was not Aristotle's intention that what he calls god should be regarded as a person. God is thought but not subjective thought. He is not thought existent in a mind, but objective thought, real on its own account, apart from any mind which things it, like Plato's idea. But Plato's mistake was to suppose that because thought is real and objective, it must exist. Aristotle avoids this error. The Absolute thought is the absolute real. But is does not exist. With the concept of God the metaphysics of Aristotle closes."[15]

---

[14] Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge Classics, 165.
[15] W.T., *A Critical History of Western Philosophy,* Macmillan Publishers, 288.

উপসংহার

পরিশেষে একথাই বলতে হয় যে, সামান্য সম্পর্কিত পূর্বোক্ত আলোচিত মত সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। কেননা, অ্যারিস্টটল প্লেটোর ধারণাতত্ত্বের সমালোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ধারণা বস্তু স্বতন্ত্র নয়। বিশেষ বিশেষ বস্তুকে নিয়েই ধারণা গঠিত হয়। ধারণা বিশেষসম্মিলিত সত্তা। যেমন - বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে সাধারণ ধর্ম মনুষ্যত্ব (আকার) ব্যক্তি মানুষ অতিরিক্ত ভিন্ন জাগতিক সত্তা নয়। তবে সামান্যের বাস্তবসত্তা 'Aristotle' স্বীকার করেন। কিন্তু কথা হল সামান্য যদি বাস্তব সত্তা হয় তাহলে তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হবে, কিন্তু ব্যক্তি মানুষ যেভাবে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় সামান্য সেভাবে কী প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় ? উত্তর হবে নিশ্চই না। তাহলে সামান্য যদি বিশেষের মতো প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হয় তাহলে বিশেষকে বাস্তবসত্তা বললেও সামান্যকে কেন বাস্তব সত্তা বলবো ? বিশেষের মতো নিছক সামান্যের তো বস্তুগত মূল্য নেই, কোন নির্দেশক মূল্য (Denotative Value) নেই। অর্থাৎ প্লেটোর মতো অ্যারিস্টটল দ্বিজাতিক সত্তা স্বীকার না করলেও, সদ্‌বস্তুরূপে সামান্য স্বীকার করেছেন যেটা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত বলে মানা যায় না। সুতরাং আমরা দেখবো সামান্যের আলোচনা প্লেটো অ্যারিস্টটল-এর পরবর্তী কালে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। না তাঁদের পরবর্তী সময় উক্ত আলোচনা সম্পূর্ণ স্থগিত হয়ে যায় ? প্রসঙ্গত আমরা লক্ষ্য করি প্রাচীন গ্রীক্ দর্শন থেকেই যেমন সামান্য সম্পর্কিত বস্তুবাদের (Realism) সূচনা হয় তেমনি নামবাদেরও (Nominalism) সূচনা হয়।

গ্রীক দার্শনিক 'Antisthenes' এর লেখাতেও আমরা এমন কথা পাই যে, "I see a hoarse, but 'hoarseness' I do not see"[1] অর্থাৎ ব্যক্তি ঘোড়া প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হলেও ব্যক্তিস্বতন্ত্র ঘোড়াত্ব নামক সামান্য অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য হওয়ায় অস্বীকৃত। আবার হেরাক্লিটাস এর মতে, সকল জাগতিক বস্তুই পরিবর্তনশীল সুতরাং তাদের মধ্যে সাধারণ ধর্মের অবস্থান কি করে সম্ভব ? প্রাচীন সুফিষ্ট সম্প্রদায়ও পরিবর্তনশীল মতবাদে বিশ্বাসী। এবং আমরা দেখবো পরবর্তী কালে সামান্য নিয়ে আলোচনা আরও গভির ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত মধ্য যুগিয়ো দার্শনিক 'Peter Abelard' কে সামান্য সম্পর্কিত নামবাদের জনক বলা হয়। তিনি মনে করেন যে, সামান্য নামমাত্র বা তাৎপর্যপূর্ণ একটি শব্দ। "... his claim that a universal is a name (nomen) or significant word (sermo)"[2]। তিনি পূর্বপক্ষ বস্তুবাদী দৃটিভঙ্গিকে তিনিটি ভাগে আলোচনা করেছেন। Material essence Realism, Indifference Realism and Collective Realism।

Material Essence Realism–এর মতে অ্যারিস্টটলের দশটি পদার্থে (Ten Categories- Substance, Quality, Quantity, Relation, Location, Time, Position, Habit, Action, Passion)[3] দশটি সাধারণ ধারণা বর্তমান। যেগুলি বস্তুসম্মিলিতভাবে অবস্থান করে এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মের ব্যক্তি বা বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে 'Realist William' –এর মতে, "it (universal) does not go against

---

[1] Frank, *A History of Philosophy*, Henry Holt and Company, 63.

[2] https://www.iep.utm.edu/abelard/ 2, Universals.

[3] http://philofbeing.com/2009/07/aristotle%E2%80%99s-ten-categories

for it to be a pure think if it were to happen that all its accidents were removed"[4] এবং তাঁর মতে ধারণা বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু পিটার এবেলাটের মতে 'Material Realism' মানলে বিশেষের বিশেষত্ব বিনষ্ট হয়। কেননা, যদি কোনো বিশেষের বিশেষ গুণকে বহির্ভূত করা হয়, তাহলে একটি বিশেষ থেকে অন্য বিশেষের পার্থক্য করা যায় না। এবং সামান্য ভাষাটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কেননা, বিশেষ আছে বলে সামান্যের প্রসঙ্গ আসে। সুতরাং উক্ত অসুবিধা অপসারণের জন্য উইলিয়াম (William of Champeaux) **'Indifference Realism'** অনুসরণ করে বলেন যে, যখন আমরা বলি 'সক্রেটিস' ও 'প্লেটো' একই ব্যক্তি তখন একথা স্বীকার করি যে, অনন্ত কিছু বৈশিষ্ট্য দুজনের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান। যেমন - তারা দুজনেই মানুষ, দুজনেই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মরণশীল জীব। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, দুজনের মধ্যে মনুষ্যত্ব নামক সাধারণ ধর্মটি বর্তমান। এর থেকে উইলিয়াম সিদ্ধান্ত নেন যে, সক্রেটিস ও প্লেটো একই মানুষ শ্রেণীর সদস্য। কেননা, সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য নেই। কিন্তু পিটারের মতে, প্রতিটি ব্যক্তি একই সাথে বিশেষ ও সামান্য হতে পারে না। সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য সামান্য এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য বিশেষ ধারণাটি বিভ্রান্তিকর উক্তি। কেননা, বিশেষ ব্যক্তি প্রত্যক্ষযোগ্য হলেও সামান্য প্রত্যক্ষযোগ্য নয় । সুতরাং বিশেষ ব্যক্তিই কেবল স্বীকৃত, সামান্য নয়। এবং **'Collective Realism'** – এর মতে বিশেষ সংগৃহীত হয়ে সামান্য তৈরী করে। যেমন বিশেষ বিশেষ মানুষ মিলে উক্তশ্রেণীর সাধারণ ধর্ম হল মনুষ্যত্ব

[4] https://www.iep.utm.edu/abelard/2, Universals.

সামান্য। কিন্তু পিটারের মতে উক্ত শ্রেণীকরণ অধিবিদ্যকভাবে সংগ্রহের পূর্ববর্তী (Prior to Collection of Individuals)।

'Peter'-এর মতে সামান্য শুধুই নামমাত্র (Mere Name) । ব্যক্তি অতিরিক্ত সামান্যের কোনো নির্দেশক মূল্য (Denotative Value) না থাকার জন্য সামান্য স্বীকারের কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল সামান্য স্বীকার না করলে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যাবে কী করে? মানুষকে মানুষ হিসেবেই জানতে গেলে পূর্ববর্তী মানুষের ধারণা বা আকার জানা প্রয়োজন। যার সাদৃশ্য পেলেই ব্যক্তি মানুষকে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে পিটার বলেন যে, "God conceives an exemplar or model in his mind before he makes individuals."[5]

কিন্ত এ কথা বললে প্রশ্ন আসে যে, ঈশ্বরের ধারণার (The idea of God) কী অন্যান্য সামান্যের মতো নির্দেশক মূল্য (Denotative Value) আছে ? নাকি শুধুই পূর্ব স্বীকৃতি (Mere Presupposition) ? প্রথমত, ঈশ্বরের ধারণার কোন নির্দেশক মূল্য জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাওয়া সম্ভব নয়, তাহলে ঈশ্বরের ধারণা পূর্বস্বীকৃতি। সুতরাং পিটারের মতবাদ প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের বস্তুবাদের মতই সম্পূর্ণ ক্রুটিমুক্ত নয়। আবার অন্যভাবে পিটারের মতবাদের দোষ দেখিয়ে বলা যায় যে, সামান্য বলে বা সামান্যের ধারণা বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে ব্যক্তি বিনষ্ট হলে ব্যক্তিবিশেষক নামও কি বিনষ্ট

---

[5] *https://www.iep.utm.edu/abelard/,2* Universals.

হয় ? এ বিষয়ে পিটারের উত্তর হবে হ্যাঁ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কিছু কাল বিনষ্ট হয়ে আবার ওই জাতীয় কোন ব্যক্তি পুনরায় উৎপন্ন হয় তাহলে তার প্রতি কোন্ নাম প্রজোয্য হবে ? তখনকার পরিস্থিতি অনুসারে যদি নামকরণ করা হয়, তাহলে একই জাতীয় ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামের অধিকারী হবে। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ কোন একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে যে নামে চিহ্নিত করি সেটা সর্বদাই একই নামে চিহ্নিত করা হয়, বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হয় না। এই সকল সমস্যার কোন সদুত্তর পিটারের নামবাদ দিতে অক্ষম।

এপ্রসঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে নামবাদের অন্যতম পুরোধা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জর্জ বার্কলে (George Berkeley) এর মতে সামান্য একটা নামমাত্র; একজাতীয় বস্তুর একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীবাচক নাম, তৎ অতিরিক্ত সামান্যের মনোনিরপেক্ষ কোন বিমূর্ত অস্তিত্ব নেই। আসলে বার্কলের নামবাদ লকের (John Locke) সামান্য সংক্রান্ত মতবাদের বিরোধিতার ফল। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শিনিক জন লকের মতে সামান্য বলে বাহ্য জগতে বিশেষ বস্তু অতিরিক্ত কোন সত্ত্বা না থাকলেও মনোজগতে সামান্যের ধারণা বিদ্যমান। সামান্য সম্পর্কে যদি কোন মানসিক চিত্র মনের মধ্যে না থাকে তাহলে স্মৃতি থেকে একজাতীয় বস্তুকে চিহ্নিত করণ সম্ভবপর হবে না। এই কারণে লকের সামান্য সংক্রান্ত মতবাদকে প্রত্যয়বাদও (Conceptualism) বলা হয়। কিন্তু বার্কলের মতে, অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্যের বিমূর্ত ধারণা স্বীকারের কোন যুক্তিই থাকে না। তিনি ‘Locke’

এর মতবাদের বিরোধিতা করে বলেন, “ For example, does it not require some pains and skill the general idea of a triangle(which is yet none of the most abstract, comprehensive, and difficult) ; for it must be neither oblique nor rectangle , neither equilateral nor scalene , but all and none of these at once?[6] আমরা এমন কোন বিমূর্ত ত্রিভূজের চিন্তা করতে পারি না যা সমবাহু, বিষমবাহু, সমদ্বিবাহু নয় আবার সমকোণী বা বিসমকোণীও নয়। ত্রিভূজ হতে গেলে উপরের কোন একটি বিকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

এপ্রসঙ্গে সমকালীন পাশ্চাত্য দার্শনিক ‘লুডভিক জোসেফ জোহান ভিটগেইনস্টাইন’ তাঁর ‘ফিলসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস’-এ পরিবার সাদৃশ্য (Family Resemblance) ধারণা দিয়ে সামান্যকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে বিভিন্ন খেলার মধ্যে একাধিক বিষয়ে মিল ও অমিল থাকার সত্ত্বেও আমরা তা খেলা বলেই অভিহিত করি। আমরা নিজেরাই ঠিক করি যে কোন খেলাকে কি নামে ডাকা হবে এবং কি কি হবে তার বৈশিষ্ট্য। ঠিক তেমনি একই জাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকার সত্ত্বেও আমরা একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে সামান্যের ধারণা গঠন করি এবং একই নামে অভিহিত করি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ খেলা অতিরিক্ত যেমন বিমূর্ত খেলার সামান্য ধারণার মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। তেমনি বিশেষ অতিরিক্ত সামান্যের

[6]Berkeley, *A Treatise Concerning The Principles of Human Knowledge*, Philadelphia: J.B. Lippincott & Co., 181,182.

মনোনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। এ প্রসঙ্গে আপত্তি উঠতে পারে যে, প্রতিটি খেলার মধ্যে সাধারণ ধর্ম বলে যদি কিছু না থাকে, তাহলে তাকে খেলা বলা হবে কেন ? আর সাধারণ ধর্ম ছাড়া খেলার সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যাবে কি করে? এক্ষেত্রে ভিটগেনস্টাইনের উক্তি হবে যে, সাধারণ ধর্ম হল আমাদের মানসিক সংস্কার বা দৃঢ়বিশ্বাস। আমরা এটা মনে করি যে, সাধারণ ধর্ম বলে কিছু থাকতেই হবে, নইলে শব্দের বা বাক্যের অর্থ জানতে পারব না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ ধর্ম বলে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।[7]

পূর্বোক্ত বস্তুবাদ ও নামবাদীদের তথ্য পর্যালোচনা করে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, উভয় মতবাদই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং বস্তুবাদীকে যদি পূর্বপক্ষ করা হয় আর নামবাদীকে যদি উত্তরপক্ষ বলা হয় তাহলে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের কারণ অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। বস্তুবাদীরা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে (প্লেটো ও অ্যারিস্টটল)। যেমন - প্লেটোর মতে সামান্য নিত্য এবং তার অবস্থান ধারণার জগতে। বস্তু জগতে তার ছায়াপাত হয় মাত্র এবং উক্ত ধারণার জগত সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য। আবার অ্যারিস্টটলের মতে সামান্য সত্তা বর্তমান তবে তা ব্যক্তি অতিরিক্ত ভিন্ন জাগতিক সত্তা রূপে নয়, ব্যক্তি অন্তঃসূত সত্তা রূপে বর্তমান। কিন্তু সেক্ষেত্রে নামবাদীদের দাবি হল উক্ত সামান্যের জাগতিক(Physical World) সত্তা আছে কি? বস্তুবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা কখনোই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে নামবাদীরা আপত্তি করে বলবেন যে,

[7] প্রিয়ম্বদা, *উত্তর-পর্বের ভিটগেনষ্টাইন, ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্স্*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৮৪।

যদি সামান্যের কোন বস্তুজাগতিক অস্তিত্ব না থাকে তাহলে অহেতুক কেন সামান্য মেনে সত্তা (ontology) বৃদ্ধি প্রয়োজন? তাঁদের দাবি হল যদি সামান্যের কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত ভাবে নির্দেশক মূল্য আকারে না প্রদর্শিত হয় তাহলে তেমন সামান্য স্বীকারের প্রয়োজন কি? শুধু বিশেষ মেনে এবং শ্রেণী বাচক শব্দ অর্থাৎ এক জাতীয় বস্তু এক শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাঁদের উক্ত শ্রেণীবাচক নামের দ্বারা যদি সমগ্র ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হয় তাহলে অহেতুক সামান্য নামক ভিন্ন জাগতিক সত্তা স্বীকারের কি প্রয়োজন? উক্ত মতানৈক্য প্রাক গ্রীক যুগ থেকে আজ একবিংশতি শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান। যে গতিতে উক্ত আলোচনা অগ্রসর হচ্ছে তাতে এটাই বোধ করি যে ভবিষ্যতেও উক্ত আলোচনা প্রায় অমীমাংসিত ভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করেই যাবে। যেটি আসলে দর্শনের কাজ। কিন্তু উক্ত প্রসঙ্গে একটি বিষয় আমার মনে হয় যে, নামবাদীরা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং বস্তুবাদীরা অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেমন জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় সমালোচনা করা সমীচীন তেমনি অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অধিবিদ্যক বিষয় সমালোচনা করাই যুক্তিযুক্ত।

যদিও উপরোক্ত আলোচনা অর্থাৎ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে সামান্যের একটি পর্যালোচনা’ এক্ষেত্রে সামান্য প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা নয়, তবুও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামান্য সম্পর্কে মত আলোচনা করে যেসকল বিষয় আমাকে ভাবিয়েছে সেগুলি একটু হলেও উল্লেখ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি।

বস্তুবাদী ন্যায় বৈশেষিক মতে সামান্য নিত্য ও অনেকের মধ্যে সমবেত। যেমন সকল মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বিরাজমান এবং উক্ত মনুষত্ব নিত্য এবং ব্যক্তি মানুষ অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হলেও মনুষ্যত্ব সামান্য অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। সেটি অলৌকিক প্রত্যক্ষের সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। ঠিক তেমনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে সামান্য বা ধারণা নিত্য এবং যদিও তা মনে হতে পারে বহু কিন্তু ঐক্য বিধায়ক সত্তা রূপে তা 'Good' বা 'God' বা 'Sun'-এ মিলিত হয়। এবং তার প্রতিচ্ছবির জগত হল আমাদের এই বস্তু জগত। যে প্রতিচ্ছবি সংখ্যায় বহু। যেটি ন্যায় বৈশেষিকের মতো সামান্যের ধারণা, যা নিত্য এবং অনেক বস্তুতে সমবেত।

অন্য দিকে আমরা যদি বৌদ্ধ দার্শনিকদের সামান্য সম্পর্কিত মত পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো যে, যেটিকে আমরা সামান্য বলি সেটি কল্পনা মিশ্রিত জ্ঞান। কিন্তু যথার্থ অর্থে জ্ঞান হল কল্পনারহিত স্বলক্ষনের জ্ঞান এবং সামান্য ব্যক্তি কল্পিত নাম মাত্র। তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। তেমনি আমরা পাশ্চাত্য দর্শনে যদি নামবাদীদের মত পর্যালোচনা করি তাহলে লক্ষ্য করবো যে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিই অস্তিত্বশীল, সামান্য নামমাত্র। শ্রেনিবাচক নাম, যেটি আমরা অনেকগুলি একই জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে নানা বৈসাদৃশ্যের সত্ত্বেও বিভিন্ন সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ভাষার আদান প্রদানের, ভাব বিনিময়ের সুবিধার্থে কল্পনা করি এবং একটি শ্রেনিবাচক নাম প্রয়োগ করি, যেটিকে নামবাদীরা সামান্য বলে মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

Bhaduri, Sadananda, *Studies in Nyaya-Vaisesika Metaphysics*, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1975.

Sen, Sushanta, *A Study Of Universals*, Visva-Bharati, Research Publications Committee, December, 1978.

Mohanty, J. N., *Classical Indian Philosophy*, Oxford University Press, New Delhi, 2000.

https://horoppa.wordpress.com/-6014/31/05/2013mimamsa-philosophy--12 categories.

Dasgupta, S.N., *A History of Indian philosophy, Vols. I to V,* Motilal Banarsidass, Delhi, 1988.

Murti, T.R.V.Murti, *The Central Philosophy of Buddhism,* Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2013.

Bandyopadhyay, Kalikrishna, *Nyayatattva Parikrama,* Papyrus, Kolkata, 1984.

Stcherbatsky,Th., *Buddhist Logic,* Vol.-I, Motilal Banarsidass, Delhi, 2008.

Singh, B. N., *Indian Logic,* Asha Prakashan, Baranasi, 1982.

Chatterjee, Satischandra, *The Nyaya Theory of Knowledge,* Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd., Delhi, 2017.

Matilal, B.K., *The Word and The World,* Oxford University Press, 2001.

Matilal, Bimal Krishna, *The Character of Logic in India*, Oxford University Press, New York, 1998.

Hiriyanna, M., *Outlines of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass, Delhi, 2009.

Chatterjee, A.K., *The Yogacara Idealism*, MLBD, Delhi 1998.

Raja, C. Kunhan and Sastri S.S Suryanarayana, *Manameyodaya of Narayana*, The Adyak Library and Research Centre, Madras-600020, 1st edition 1933.

Michael J. Loux: *Metaphysics: A Contemporary Introduction,* Routledge, 2006.

DI Bella, Stefano and M. Schmaltz Tad (Editors), *The Problem of Universals in Early Modern Philosophy*, kindle Edition, Oxford University Press, 29th June, 2017.

Galluzzo, Gabriele and Loux, Michael. J. (Editors), *The Problem of Universals in Contemporary Philosophy*, Cambridge University Press, 15th March, 2018.

Strawson, P.F., *Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics*, Methuen, 1957.

Lowe, E. J. '*Substance', An Encyclopedia of philosophy*, Routledge, 1996.

Cornford, Francis Macdonald, *The Republic of Plato*, Oxford, Clarendon Press, 1966.

Tancred, Huge Lawson*, Aristotle: The Metaphysics*, Penguin Books, 2004.

Berkeley, George, *A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge*, Philadelphia: j.b. Lippincott & co., 1874.

Smith, K., N., *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*, Macmillan, London, 1929.

Russell, Bertrand, *History of Western Philosophy*, Routledge Classics, 2016.

Mumford, Stephen, *Russell on Metaphysics*, Routledge, 2003.

Copleston, F., *A History of Philosophy* (I, IV, V, & VII), Continuum Publishers, London, 1946-1974.

Stace, W.T. *A Critical History of Greek Philosophy*, MacMillan and St. Martine's, 1967.

Hamlyn, D.W., *Metaphysics*, Cambridge University Press, 1984.

Chakraborti, S., *Realism and its alternatives*, Papyrus, 2000.

Gupta, Chanda, *Realism versus Realism*, Allied, 1995.

Taylor, Richard, *Metaphysics*, Pearson, 1st September, 1991.

Bradley, F.H., *Appearance and Reality*, Franklin Classics, 8th October, 2018.

Mondal, Samar Kumar, *What am I? Strawson's Concept of a Person,* Abhijit Publications, New Delhi, 2012.

Thilly, Frank, *A History of Philosophy*, Henry Holt And Company, New York, December, 1924.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অভীক কুমার, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; সংক্ষিপ্ত রূপরেখা,* সাঁতরা পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮।

সরকার, প্রিয়ম্বদা, *উত্তর-পর্বের ভিটগেনষ্টাইন, ফিলোসফিকাল ইনভেষ্টিগেশন্স্,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, মার্চ, ২০০৭।

তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পঞ্চম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪/এ।

শাস্ত্রী, পঞ্চানন, *বৌদ্ধ দর্শন,* প্রথম সংস্করণ, জয়গুরু পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য্য, করুণা, *ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৩।

মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, *বৈশেষিক দর্শন,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ২০০৪।

দামোদরাশ্রমঃ, দণ্ডিস্বামী(অনুবাদাদিকারকঃ), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১০।

ভট্টাচার্য্য, শ্রীমৎ পঞ্চানন, শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথন্যায়পঞ্চাননভট্টাচার্য্যবিরচিতঃ *ভাষা-পরিচ্ছেদঃ;* সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিতঃ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

ন্যায়াচার্য, শ্রী গঙ্গাধর কর, *শ্রী কেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা,* দ্বিতীয় খণ্ড, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

সাবির আলি, সেখ, *শঙ্করমিশ্রকৃতঃ বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা।

গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, *শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ; সটীকঃ তর্কসংগ্রহঃ; অধ্যাপনাসহিতঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, *ধর্মকীর্ত্তি রচিত ন্যায়বিন্দু,* সাহিত্যশ্রী, কলকাতা-৯, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি(সম্পাদিত), মণ্ডল, শ্রীপ্রদ্যোতকুমার, মিত্র, শ্রীপ্রণবকুমার, *ভারতীয় দর্শন,* বিশ্বাস বুক স্টল, কলিকাতা-৯, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।